কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্তাহার

দুনিয়ার মজদুর এক হও

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার

সূচি

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সমিতি — কমিউনিস্ট লীগ, তখনকার অবস্থা অনুসারে যার অবশ্য গুপ্ত সমিতি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডনে এর যে কংগ্রেস বসে তা থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের উপর পার্টির একটি বিশদ তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক কর্মসূচি প্রকাশের জন্য রচনা করার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। যে ইস্তাহারটি এখানে দেওয়া হল তার উৎপত্তি হয়েছে এইভাবে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (১) কয়েক সপ্তাহ আগে এই পাণ্ডুলিপিটি ছাপার জন্য লন্ডনে যায়। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশের পর জার্মানি, ইংলন্ড ও আমেরিকা থেকে এটি জার্মান ভাষায় অন্তত বারটি বিভিন্ন সংস্করণে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজিতে, শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেনের অনুবাদে, এর প্রথম প্রকাশ হয়েছিল লন্ডনের Red Republican-এ ১৮৫০ সালে এবং পরে ১৮৭১ সালে আমেরিকায় অন্তত তিনটি স্বতন্ত্র অনুবাদে। ফরাসি অনুবাদ প্রথম বের হয় প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের (২) সামান্য আগে, আবার সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে নিউ ইয়র্কের Le Socialiste পত্রিকায়। আরও একটি অনুবাদের কাজ এখন চলছে। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হওয়ার কিছু পরেই লন্ডনে হয় এর রুশ অনুবাদ। প্রথম প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে এটি অনুবাদ করা হয় ডেনিশ ভাষাতেও। গত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইস্তাহার'-এ যেসব সাধারণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছিল তা আজও মোটামুটিভাবে আগের মতোই সঠিক। এখানে-ওখানে সামান্য দু-একটি খুঁটিনাটি কথা হয়তো আরও ভালো করে লেখা যেত। সর্বত্র এবং সবসময়ে মূলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপরে, 'ইস্তাহার'-এর মধ্যেই সে কথা রয়েছে, সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যেসব বৈপ্লবিক ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। আজকের দিনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখতে হত। গত পঁচিশ বছরে আধুনিক যন্ত্রশিল্প বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির পার্টি-সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, পরে আরও বেশি করে প্যারিস কমিউনে (৩) যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুমাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, তার ফলে এই কর্মসূচির খুঁটিনাটি কিছু বিষয় সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন বিশেষ করে একটা কথা প্রমাণ করেছে যে, 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটার শুধু দখল পেলেই শ্রমিক শ্রেণি তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।' ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ', জার্মান সংস্করণ, ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। তা ছাড়া এ কথা স্বভাবতই স্পষ্ট যে, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের দিনের হিসাবে অসম্পূর্ণ, কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মাত্র ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত, তা ছাড়া বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও (চতুর্থ অধ্যায়ে), সাধারণ মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে অকেজো হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে এবং উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশকে ইতিহাসের অগ্রগতি এই দুনিয়া থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে।

কিন্তু এই 'ইস্তাহার' এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলাবার কোনো অধিকার আমাদের আর নেই। সম্ভবত পরবর্তী কোনো সংস্করণ বের করা যাবে যাতে ১৮৪৭ থেকে আজ অবধি ব্যবধানের কালটুকু নিয়ে একটা ভূমিকা থাকবে, বর্তমান সংস্করণ এত অপ্রত্যাশিতভাবে বেরল যে আমাদের পক্ষে তার জন্য সময় ছিল না।

কার্ল মার্কস, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস
লন্ডন, ২৪ জুন, ১৮৭২

১৮৮২ সালের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের ভূমিকা

'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এর প্রথম রুশ সংস্করণ, বাকুনিনের অনুবাদে, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে (৪) 'কলোকোল' (৫) পত্রিকার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন পশ্চিমের কাছে এটা ('ইস্তাহার'-এর রুশ সংস্করণ) মনে হতে পারত একটা সাহিত্যিক কৌতূহলের বিষয় মাত্র। আজ তেমনভাবে দেখা অসম্ভব।

তখনও পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৮৪৭) প্রলেতারিয় আন্দোলন কত সীমাবদ্ধ স্থান জুড়ে ছিলে, সে কথা সবচেয়ে পরিষ্কার করে দেয় 'ইস্তাহার'-এর 'বিদ্যমান বিভিন্ন বিরোধী পার্টির সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অবস্থান' শীর্ষক শেষ অধ্যায়টি, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখই নেই এখানে। সে যুগে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরাট শেষ আশ্রয়স্থল এবং যুক্তরাষ্ট্র টেনে নিচ্ছিল ইউরোপিয় প্রলেতারিয়েতের উদ্বৃত্ত অংশটাকে অভিবাসনের মধ্য দিয়ে। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল যোগাত, আর সেইসঙ্গে ছিল তার শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয়ের বাজার। সে যুগে তাই দুই দেশই কোনো না কোনোভাবে ছিল ইউরোপের চলতি ব্যবস্থার স্তম্ভ।

আজ অবস্থা কত বদলে গেছে! ইউরোপিয়দের অভিবাসনের দরুনই উত্তর আমেরিকা বৃহৎ কৃষি-উৎপাদনের যোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, তার প্রতিযোগিতা ইউরোপের ছোটো বড়ো সমস্ত ভূসম্পত্তির ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। তা ছাড়া এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল শিল্পসম্পদকে এমন শক্তি দিয়ে ও এমন আয়তনে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে যে শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলন্ডের যে একচেটিয়া অধিকার আজও বজায় রয়েছে, তা অচিরে ভেঙে পড়তে বাধ্য। এ দুটি ব্যাপার আবার আমেরিকাতেই বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। গোটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে কৃষকের ছোটো ও মাঝারি ভূসম্পত্তি ছিল, তা ক্রমে ক্রমে বৃহদায়তন খামারের প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে পড়ছে, সেইসঙ্গে শিল্পাঞ্চলে এই প্রথম ঘটছে প্রচুর সংখ্যায় প্রলেতারিয়েত ও অবিশ্বাস্যভাবে পুঁজির কেন্দ্রীভবনের বিকাশ।

আর এখন রাশিয়া! ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময়ে শুধু ইউরোপিয় রাজন্যবর্গ নয়, ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণি পর্যন্ত সদ্যজাগরণোন্মুখ প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় দেখেছিল রাশিয়ার হস্তক্ষেপে। জারকে ঘোষণা করা হয়েছিল ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার প্রধান সর্দার বলে। সেই জার আজ বিপ্লবের কাছে গাৎচিনায় যুদ্ধবন্দি (৬), আর ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া।

আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্যভাবে আসন্ন অবসানের কথা ঘোষণা করাই ছিল 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখি, দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিতান্ত্রিক জুয়াচুরি ও বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূসম্পত্তির মুখোমুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে চাষিদের যৌথ মালিকানা। এখন প্রশ্ন হল, অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেলেও জমির উপর যৌথ মালিকানার আদি রূপ এই রুশ অব্‌শ্চিনা (obshchina)* কি কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানার উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে? না কি পক্ষান্তরে তাকেও প্রথমে যেতে হবে ভাঙনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যা পশ্চিমের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে?

এর একমাত্র যে-উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা এই : রাশিয়ার বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারিয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে রাশিয়ার ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসেবে।

কার্ল মার্কস, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস
লন্ডন, ২১ জানুয়ারি, ১৮৮২

*অব্‌শ্চিনা : স্বশাসিত গ্রামীণ সমাজ।

১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা, হায়, আমাকে একলাই সই করতে হবে। ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র শ্রমিক শ্রেণি যাঁর কাছে অন্য যেকোনো মানুষের চাইতে বেশি ঋণী, সেই মার্কস হাইগেট সমাধি-ভূমিতে চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন, আর তাঁর সমাধির উপর ইতিমধ্যেই মাথা তুলেছে প্রথম ঘাসের গুচ্ছ। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইস্তাহার'-এ সংশোধন বা সংযোজন করা আরও অভাবনীয়। তাই এখানে স্পষ্ঠভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার বলা আমি আরও বেশি প্রয়োজন মনে করি।

'ইস্তাহার'-এর ভিতরে যে মূলচিন্তা প্রবহমান তা এই যে, ইতিহাসের প্রতি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং যে সমাজ-সংগঠন তা থেকে আবশ্যিকভাবে গড়ে ওঠে, তা-ই থাকে সে যুগের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত ইতিহাসের মূলে, সুতরাং (জমির আদিম যৌথ মালিকানার অবসানের পর থেকে) সমগ্র ইতিহাস হয়ে এসেছে শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস, সমাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে শোষিত ও শোষক, অধীনস্থ ও অধিপতি শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস, কিন্তু এই সংগ্রাম আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে একই সঙ্গে গোটা সমাজকে শোষণ, নিপীড়ন ও শ্রেণি-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে, শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণি (প্রলেতারিয়েত) নিজেকে শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণির (বুর্জোয়া) কবল থেকে মুক্ত করতে পারে না — এই মূলচিন্তাটি পুরোপুরি ও একান্তভাবে মার্কসেরই চিন্তা* । এ কথা এর পূর্বেও বহুবার বলেছি, কিন্তু ঠিক আজকেই এ বক্তব্য 'ইস্তাহার'-এর পুরোভাগেও থাকা প্রয়োজন।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৮ জুন, ১৮৮৩

*ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম : 'ডারইউনের তত্ত্ব (৭) জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই প্রতিজ্ঞা ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই ধীরে ধীরে এই প্রতিজ্ঞার দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার সবচেয়ে ভালো নিদর্শন আমার 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' রচনাটি। কিন্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্স্ শহরে মার্কসের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, তখন মার্কস ইতিমধ্যেই সেটা সমাধা করে ফেলেছেন এবং এখানে আমি যে ভাষায় মূলকথাটা উপস্থিত করলাম, প্রায় তেমন পরিষ্কারভাবেই তিনি তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন'। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

এই 'ইস্তাহার' প্রকাশিত হয়েছিল 'কমিউনিস্ট লিগ'-এর কর্মসূচি হিসেবে, যে লিগ ছিল মেহনতি মানুষের সংগঠন, প্রথমটা পুরোপুরি জার্মান ও পরে আন্তর্জাতিক চরিত্রের এবং ১৮৪৮ সালের আগেকার ইউরোপ মহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাতে তাকে অনিবার্যভাবে হতে হয় গুপ্ত সমিতি। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লিগের লন্ডন কংগ্রেসে মার্কস ও এঙ্গেলসকে ভার দেওয়া হয়েছিল একটা বিশদ তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক পার্টি-কর্মসূচি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করতে। ১৮৪৮-এর জানুয়ারিতে জার্মান ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপিটি ২৪ ফেব্রুয়ারির ফরাসি বিপ্লবের (৮) কয়েক সপ্তাহ আগে লন্ডনে মুদ্রাকরের কাছে পাঠানো হয়। ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের সামান্য আগে এর ফরাসি অনুবাদ প্যারিসে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেন-কৃত প্রথম ইংরেজি অনুবাদ বেরোয় ১৮৫০ সালে লন্ডনে, জর্জ জুলিয়ান হার্নির Red Republican পত্রিকায়। ডেনিশ ও পোলিশ সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪৮-এর জুন মাসে প্যারিসের অভ্যুত্থানের পরাজয়ে, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের এই প্রথম মহাসংগ্রাম ইউরোপিয় শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ফের কিছুদিনের মতো পিছনে হটে গেল। তারপর থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগেকার মতো কেবল মালিক শ্রেণির নানা অংশের মধ্যেই ক্ষমতাদখলের লড়াই চলতে থাকে, শ্রমিক শ্রেণিকে রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গুঁতোগুঁতিতে নেমে আসতে হয়, মধ্য শ্রেণিদের নিয়ে র‍্যাডিক্যালদের চরমপন্থী অংশ রূপে দাঁড়াতে হয় তাদের। যেখানেই স্বাধীন প্রলেতারিয় আন্দোলনে জীবনের লক্ষণ দেখা গেল, সেখানেই তাকে দমন করা হল নির্মমভাবে। এইভাবেই সে সময়ে কলোন্ শহরে অবস্থিত 'কমিউনিস্ট লীগের' কেন্দ্রীয় কমিটিতে হানা দেয় প্রাশিয়ার পুলিস। তার সদস্যরা গ্রেপ্তার হল এবং আঠারো মাস কারাবাসের পর ১৮৫২ সালের অক্টোবরে তাদের বিচার হয়। এই প্রসিদ্ধ 'কলোন্ কমিউনিস্টদের বিচার' চলেছিল ৪ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর, বন্দিদের সাতজনকে তিন থেকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল এক দুর্গের অভ্যন্তরে। দণ্ড ঘোষণার অব্যবহিত পরে বাকি সদস্যর লিগ সংগঠনকে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেয়। আর 'ইস্তাহার' সম্বন্ধে মনে হল যে, এরপর থেকে তার কথা ভুলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

ইউরোপিয় শ্রমিক শ্রেণি যখন শাসক শ্রেণিকে আর-একটা আক্রমণের মতো পর্যাপ্ত শক্তি ফিরে পেল, তখন আবির্ভূত হল 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি' (International Working Men's Association)। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র জঙ্গি প্রলেতারিয়েতকে একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংগঠিত করার বিশেষ উদ্দেশ্য থাকাতে এই সমিতি 'ইস্তাহার'-এ লিপিবদ্ধ মূলনীতিগুলি সরাসরি ঘোষণা করতে পারে নি। আন্তর্জাতিক-এর কর্মসূচি বাধ্য হয়েই এতটা প্রশস্ত করতে হয় যাতে তা গ্রহণীয় হয় ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের, ফ্রান্স-বেলজিয়াম-ইতালি ও স্পেনে প্রুধোঁর অনুগামীদের (৯) এবং জার্মান লাসালপন্থীদের* (১০) কাছে। মার্কস সকল দলের সন্তোষ বিধান করে এই কর্মসূচি রচনা করেছিলেন, মিলিত কাজ আর পারস্পরিক আলোচনার ফলে শ্রমিক শ্রেণির যে বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশ ঘটতে বাধ্য ছিল, তিনি তার উপরেই পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঘটনা ও দুর্বিপাকেই, জয়লাভের চাইতেও পরাজয়ে শ্রমিকদের এই জ্ঞানোদয় না হয়ে পারে নি যে তাদের সাধের নানা টোটকাগুলি (nostrums) অপর্যাপ্ত এবং তা শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির আসল শর্ত সম্বন্ধে পূর্ণতর অন্তর্দৃষ্টির পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। মার্কস ঠিকই বুঝেছিলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক সৃষ্টির সময় শ্রমিকেরা যে অবস্থায় ছিল তা থেকে একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে তারা বেরিয়ে আসে ১৮৭৪ সালে আন্তর্জাতিক ভেঙে যাবার সময়ে। ফ্রান্সে প্রুধোঁবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থা তখন মুমূর্ষু, এমন কি রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলিও, তাদের অধিকাংশই বহুদিন যাবৎ আন্তর্জাতিক-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকলেও, ধীরে ধীরে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসছিল যে, গত বছর সোয়ানসি শহরে তাদের কংগ্রেসের

* লাসাল আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই স্বীকার করতেন যে, তিনি মার্কসের শিষ্য এবং সেই হিসেবে 'ইস্তাহার'ই তাঁর ভিত্তি। কিন্তু ১৮৬২-১৮৬৪ সালের প্রকাশ্য আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রের ঋণের সাহায্যে উৎপাদক সমবায়ের দাবির বেশি অগ্রসর হন নি। (এঙ্গেলসের টীকা।)

সভাপতি* তাদের নামেই ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, 'ইউরোপিয় মহাদেশের সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আর বিভীষিকা নেই।' বস্তুত, সকল দেশের মেহনতি মানুষের মধ্যে 'ইস্তাহার'-এর নীতিগুলি অনেক পরিমাণে ছড়িয়েছে।

তাই 'ইস্তাহার'টি আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৮৫০ সালের পর তার জার্মান পাঠ কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড ও আমেরিকাতে। ১৮৭২ সালে নিউ ইয়র্কে ইংরেজি অনুবাদ হয়েছিল, অনুবাদটি সেখানকার Woodhull and Claflin's Weekly-তে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজি পাঠ থেকে একটা ফরাসি অনুবাদ হয় নিউ ইয়র্কের Le Socialiste পত্রিকায়। এরপর কিছুটা বিকৃতি থাকলেও অন্তত আরও দুটি ইংরেজি অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ইংলন্ডে। প্রথম রুশ অনুবাদ বাকুনিনের করা, সেটি জেনেভা শহরে হের্ৎসেনের 'কলোকোল' পত্রিকার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ নাগাদ, দ্বিতীয় অনুবাদ করেন বীর নারী ভেরা জাসুলিচ, তা বের হয় ১৮৮২ সালে জেনেভাতেই। এক নতুন ডেনিশ সংস্করণ পাওয়া যাবে কোপেনহাগেনে ১৮৮৫ সালের Socialdemokratisk Bibliothek-এ, নতুন এক ফরাসি অনুবাদ আছে প্যারিসে ১৮৮৬ সালের Le Socialiste পত্রিকায়। শেষেরটি অনুসরণে একটা স্পেনিয় অনুবাদ মাদ্রিদে ১৮৮৬ সালে প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়। জার্মান পুনর্মুদ্রণের সংখ্যা অনেক, খুব কম করেও অন্তত বারো। কয়েক মাস আগে কন্স্ট্যান্টিনোপল থেকে একটা আর্মেনিয়ান অনুবাদ প্রকাশের কথা ছিল, কিন্তু শুনেছি তা প্রকাশিত হয় নি এই জন্য যে, প্রকাশক মার্কসের নামাঙ্কিত বই বের করতে সাহস পান নি আর অনুবাদক লেখাটা নিজের বলে প্রচার করতে রাজি হন নি। অন্যান্য ভাষায় আরও অনুবাদের কথা আমি শুনেছি কিন্তু নিজের চোখে দেখি নি। সুতরাং 'ইস্তাহার'-এর ইতিহাস অনেকাংশে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসই প্রতিফলিত করছে, আজকের দিনে নিঃসন্দেহে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সবচেয়ে প্রচারিত, সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সাহিত্যকীর্তি এটাই, সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ একে মেনে নিয়েছে নিজেদের সাধারণ কর্মসূচি হিসেবে।

কিন্তু এটি যখন লেখা হয়েছিল, তখন একে সমাজতন্ত্রী ইস্তাহার বলা সম্ভব ছিল না। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী বলতে বোঝাত একদিকে বিভিন্ন ইউটোপিয় মততন্ত্রের অনুগামীদের, যেমন ইংলন্ডে ওয়েনপন্থী (১১), ফ্রান্সে ফুরিয়েপন্থীরা (১২), উভয়েই তখন সংকীর্ণ গোষ্ঠীর পর্যায়ে নেমে গিয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল, অন্যদিকে বোঝাত অতি বিচিত্র সব সামাজিক হাতুড়েদের, এরা নানাবিধ তুকতাকে পুঁজি ও মুনাফার কোনও ক্ষতি না করে সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার করার প্রতিশ্রুতি দিত, উভয় ক্ষেত্রের লোকেরাই ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে, উভয়েরই চোখ ছিল 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের সমর্থনের দিকেই। শ্রমিক শ্রেণির যেটুকু অংশ নিতান্ত রাজনৈতিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা বুঝেছিল এবং সমাজের সম্পূর্ণ বদলের প্রয়েজানীয়তা ঘোষণা করেছিল, সেই অংশ তখন নিজেদের কমিউনিস্ট নামে পরিচয় দিত। অবশ্য এ ছিল একটা স্থূল, অসংস্কৃত, নিতান্তই সহজ প্রবৃত্তি ধরনের কমিউনিজম, তবু এতে মূলকথাটা ধরা পড়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এর এতটা প্রভাব ছিল যে, এ থেকে জন্ম নেয় ফ্রান্সে কাবে-র ও জার্মানিতে ভাইটলিং-এর (১৩) ইউটোপিয় কমিউনিজম। তাই ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন আর কমিউনিজম শ্রমিক শ্রেণির। অন্তত ইউরোপ মহাদেশে সমাজতন্ত্র ছিল 'ভদ্রস্থ', আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। আর প্রথম থেকেই যেহেতু আমাদের ধারণা ছিল যে 'শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি শ্রমিক শ্রেণিরই নিজস্ব কাজ হতে হবে', তাই এই দুই নামের মধ্যে কোনটা আমরা নেব সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় ছিল না। তা ছাড়া আজ পর্যন্ত আমরা এ নাম বর্জন করার দিকেও যাই নি।

যদিও 'ইস্তাহার আমাদের দুজনের রচনা, তবু আমাকে এটা বলতেই হবে যে, এর মৌল প্রতিজ্ঞাটি, যা তার মর্মকেন্দ্র, সেটা একান্তভাবেই মার্কসের। সেই প্রতিজ্ঞাটি এই : ইতিহাসের প্রতিটি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিনিময়ের প্রধান পদ্ধতি এবং তার আবশ্যিক পরিণতিরূপে যে সামাজিক সংগঠন — তাই হল একটা ভিত্তি, যার উপর গড়ে ওঠে সে যুগের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত ইতিহাস এবং একমাত্র তা দিয়েই এ ইতিহাসের

* ডবলিউ. বিভেন। — সম্পাঃ

ব্যাখ্যা করা চলে, সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস (জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের অবসানের পর থেকে) হল শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক এবং শোষিত, শাসক এবং নিপীড়িত শ্রেণির মধ্যে লড়াইয়ের ইতিহাস, শ্রেণি-সংগ্রামের এই ইতিহাস হল বিবর্তনের কয়েকটি পর পর ধারা, যা আজকের দিনে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে, যেখানে একই সঙ্গে গোটা সমাজকে সকল শোষণ, নিপীড়ন, শ্রেণি-পার্থক্য ও শ্রেণি-সংগ্রাম থেকে বরাবরের মতো মুক্তি না দিয়ে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণিটি — অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত — শোষক ও শাসকের, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির কর্তৃত্বের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

ডারইউনের তত্ত্ব (১৪) জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই প্রতিজ্ঞা ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই ধীরে ধীরে এই প্রতিজ্ঞার দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার সবচেয়ে ভালো নিদর্শন আমার 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' রচনাটি* । কিন্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্‌স্ শহরে মার্কসের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, তখন মার্কস ইতিমধ্যেই সেটা সমাধা করে ফেলেছেন এবং এখানে আমি যে ভাষায় মূলকথাটা উপস্থিত করলাম, প্রায় তেমন পরিষ্কারভাবেই তিনি তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণে আমাদের মিলিত ভূমিকা থেকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করছি :

'গত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইস্তহার'-এ যেসব সাধারণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছিল তা আজও মোটামুটিভাবে আগের মতোই সঠিক। এখানে ওখানে সামান্য দুএকটি খুঁটিনাটি কথা হয়তো আরও ভালো করে লেখা যেত। সর্বত্র এবং সব সময়ে মূলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, 'ইস্তাহার'-এর মধ্যেই সে কথা রয়েছে, সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যেসব বৈপ্লবিক ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। আজকের দিনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখতে হত। ১৮৪৮-এর পর থেকে আধুনিক যন্ত্রশিল্প বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির পার্টি-সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, পরে আরও বেশি করে প্যারিস কমিউনে (১৫), যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুমাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচির খুঁটিনাটি কিছু বিষয় সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন বিশেষ করে একটা কথা প্রমাণ করেছে যে : 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটার শুধু দখল পেলেই শ্রমিক শ্রেণি তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।' ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ', লন্ডন, ট্রুলাভ, ১৮৭১, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। তা ছাড়া এ কথা স্বভাবতই স্পষ্ট যে, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের দিনের হিসাবে অসম্পূর্ণ, কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মাত্র ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত, তা ছাড়া বিভিন্ন বিরোধী পার্টির সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অবস্থান সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও (চতুর্থ অধ্যায়ে), সাধারণ মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে অকেজো হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে এবং উল্লিখিত রাজনৈতিক পার্টিগুলির অধিকাংশকে ইতিহাসের অগ্রগতি এই দুনিয়া থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে।

'কিন্তু এই 'ইস্তাহার' এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলাবার কোনও অধিকার আমাদের আর নেই।'

মার্কসের 'পুঁজি' বইটির বেশির ভাগটার অনুবাদক মিঃ স্যামুয়েল মুরই এই অনুবাদ করেছেন। আমরা দুজনে মিলে এর সংশোধন করেছি, কয়েকটি ঐতিহাসিক উল্লেখের ব্যাখ্যা হিসেবে কিছু টীকা আমি সংযোজন করেছি।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ৩০ জানুয়ারি, ১৮৮৮

---

* ('The Condition of the Working Class in England in 1844'. By Frederick Engels. Translated by Florence K. Wishnewetzky, New York, Lovell-London. W. Reeves, 1888. (এঙ্গেলসের টীকা।)

১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

উপরের কথাগুলো* লেখার পর 'ইস্তাহার'-এর একটি নতুন জার্মান সংস্করণের প্রয়োজন হয়েছে এবং 'ইস্তাহার'-এর ক্ষেত্রে অনেক কিছু ঘটেছে যার উল্লেখ করা উচিত।

ভেরা জাসুলিচ অনূদিত একটি দ্বিতীয় রুশ সংস্করণ ১৮৮২ সালে জেনেভায় প্রকাশিত হয়েছিল, এ সংস্করণের ভূমিকা মার্কস ও আমি লিখেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত মূল জার্মান পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে, তাই রুশ থেকে তা ফের অনুবাদ করে দিচ্ছি, মূল পাঠ থেকে তা বিশেষ উন্নততর হবে না। ভূমিকাটিই এই :

'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এর প্রথম রুশ সংস্করণ, বাকুনিনের অনুবাদে, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে 'কলোকোল' পত্রিকার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন পশ্চিমের কাছে এটা ('ইস্তাহার'-এর রুশ সংস্করণ) মনে হতে পারত একটা সাহিত্যিক কৌতূহলের বিষয় মাত্র। আজ তেমনভাবে দেখা অসম্ভব। তখনও পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৮৪৭) প্রলেতারিয় আন্দোলন কত সীমাবদ্ধ স্থান জুড়ে ছিলে, সে কথা সবচেয়ে পরিষ্কার করে দেয় 'ইস্তাহার-এর 'বিদ্যমান বিভিন্ন বিরোধী পার্টির সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অবস্থান' শীর্ষক শেষ অধ্যায়টি। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখই নেই এখানে। সে যুগে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরাট শেষ আশ্রয়স্থল এবং যুক্তরাষ্ট্র টেনে নিচ্ছিল ইউরোপিয় প্রলেতারিয়েতের উদ্বৃত্ত অংশটাকে অভিবাসনের মধ্য দিয়ে। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল যোগাত, আর সেইসঙ্গে ছিল তার শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয়ের বাজার। সে যুগে তাই দুই দেশই কোনো না কোনোভাবে ছিল ইউরোপের চলতি ব্যবস্থার স্তম্ভ।

আজ অবস্থা কত বদলে গেছে! ইউরোপিয়দের অভিবাসনের দরুনই উত্তর আমেরিকা বৃহৎ কৃষি-উৎপাদনের যোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, তার প্রতিযোগিতা ইউরোপের ছোটো বড়ো সমস্ত ভূসম্পত্তির ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। তা ছাড়া এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল শিল্পসম্পদকে এমন শক্তি দিয়ে ও এমন আয়তনে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে যে শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলন্ডের যে একচেটিয়া অধিকার আজও বজায় রয়েছে, তা অচিরে ভেঙে পড়তে বাধ্য। এ দুটি ব্যাপার আবার আমেরিকাতেই বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। গোটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে কৃষকের ছোটো ও মাঝারি ভূসম্পত্তি ছিল, তা ক্রমে ক্রমে বৃহদায়তন খামারের প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে পড়ছে, সেইসঙ্গে শিল্পাঞ্চলে এই প্রথম ঘটছে প্রচুর সংখ্যায় প্রলেতারিয়েত ও অবিশ্বাস্যভাবে পুঁজির কেন্দ্রীভবনের বিকাশ।

আর এখন রাশিয়া! ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময়ে শুধু ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নয়, ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণি পর্যন্ত সদ্যজাগরণোন্মুখ প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় দেখেছিল রাশিয়ার হস্তক্ষেপে। জারকে ঘোষণা করা হয়েছিল ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার প্রধান সর্দার বলে। সেই জার আজ বিপ্লবের কাছে গাৎচিনায় যুদ্ধবন্দি, আর ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া।

আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্যভাবে আসন্ন অবসানের কথা ঘোষণা করাই ছিল 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখি দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিতান্ত্রিক জুয়াচুরি ও বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূসম্পত্তির মুখোমুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে চাষিদের যৌথ মালিকানা।

এখন প্রশ্ন হল, অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেলেও জমির উপর যৌথ মালিকানার আদি রূপ এই রুশ অব্‌শ্চিনা (obshchina) কি কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানার উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে? না কি পক্ষান্তরে তাকেও প্রথমে যেতে হবে ভাঙনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যা পশ্চিমের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে?

এর একমাত্র যে-উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা এই : রাশিয়ার বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারিয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে রাশিয়ায় ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসেবে।

কার্ল মার্কস, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস
লন্ডন, ২১ জানুয়ারি, ১৮৮২

প্রায় একই সময়ে জেনেভায় প্রকাশিত হয় একটি নতুন পোলিশ সংস্করণ : Manifest Komunistyczny।

তা ছাড়া Socialdemokratisk Bibliothek, কোপেনহাগেন থেকেও ১৮৮৫ সালে একটি নতুন ডেনিশ সংস্করণ বেরিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এটি খুব সুসম্পূর্ণ নয়, অনুবাদকের কাছে সম্ভবত দুরূহ বোধ হওয়ায় কতকগুলি জরুরি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তা ছাড়া স্থানে স্থানে অযত্নের লক্ষণ আছে, সেটা চোখে লাগে আরো বেশি এই কারণে যে, অনুবাদ থেকে বোঝা যায়, অনুবাদক আর একটু কষ্ট করলে চমৎকার কাজ করতে পারতেন।

১৮৮৬ সালে প্যারিসের Le Socialiste-এ প্রকাশিত হয়েছে একটি নতুন ফরাসি অনুবাদ, আজ পর্যন্ত এইটিই সেরা সংস্করণ।

এই ফরাসি থেকে একটি স্পেনিয় অনুবাদ প্রকাশিত হয় ওই বছরেই, প্রথমে মাদ্রিদের El Socialista-তে, পরে পুস্তিকাকারে : 'Manifesto del Partido Comunista' por Carlos Marx y F. Engels, Madrid, Administracion de El Socialista, Hernan Cortes ।

একটা মজার ব্যাপার হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর্মেনিয়ান অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি দেওয়া হয়েছিল কন্‌স্ট্যান্টিনোপল-এর একটি প্রকাশকের কাছে। কিন্তু মার্কসের নামাঙ্কিত কোনো কিছু প্রকাশের সাহস এই সুবোধ ব্যক্তিটির হয় নি এবং তিনি বলেন লেখক হিসেবে অনুবাদকের নামটাই দেওয়া হোক, অনুবাদক কিন্তু তাতে আপত্তি করেন।

ইংলন্ড থেকে প্রথমে একটি ও পরে আর একটি ন্যূনাধিক বেঠিক আমেরিকান অনুবাদ বারম্বার পুনর্মুদ্রিত হবার পর অবশেষে ১৮৮৮ সালে একটি প্রামাণ্য অনুবাদ বেরিয়েছে। অনুবাদ করেন আমার বন্ধু স্যামুয়েল মুর এবং প্রেসে পাঠাবার আগে আমরা দুজনে মিলে তা দেখে দিই। এটির নাম দেওয়া হয় : Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorised English Translation, edited and annotated by Frederick Engels, 1888. London, William Reeves, 185. Fleet st., E. C.। তার কতকগুলি টীকা আমি বর্তমান সংস্করণটিতেও যোগ করেছি।

'ইস্তাহার'-এর একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। সংখ্যায় তখন পর্যন্ত বেশি নয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এহেন এগ্রণীদের কাছ থেকে এর প্রকাশকালে জুটেছিল সোৎসাহ অভ্যর্থনা (প্রথম ভূমিকায় উল্লিখিত অনুবাদগুলিই তার প্রমাণ), কিন্তু ১৮৪৮ সালের জুনে প্যারিস শ্রমিকদের পরাজয়ের (১৬) পর যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তার চাপে বাধ্য হয়ে একে পশ্চাদপসরণ করতে হল, এবং ১৮৫২ সালের নভেম্বরে কলোন্ কমিউনিস্টদের দণ্ডাজ্ঞার পর (১৭) শেষ পর্যন্ত 'আইন অনুসারে' তাকে আইন-বহির্ভূত করা হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব থেকে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, লোকচক্ষু থেকে তার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইস্তাহার'-ও অন্তরালে চলে যায়।

শাসক শ্রেণিদের ক্ষমতার উপর নতুন আক্রমণের পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তি যখন ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণি আবার সংগ্রহ করতে পারল তখন 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির' উদয় হয়। তার লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার গোটা জঙ্গি শ্রমিক শ্রেণিকে একটি বিরাট বাহিনিতে সুসংহত করা। সুতরাং 'ইস্তাহার'-এ লিপিবদ্ধ নীতি থেকে তা শুরু হতে পারে না। এমন কর্মসূচি তাকে নিতে হয় যাতে ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, ফরাসি, বেলজিয়ামের, ইতালিয় ও স্পেনিয় প্রুধোঁবাদী এবং জার্মান লাসালপন্থীদের* কাছে যেন দরজা বন্ধ না হয়ে যায়। এই কর্মসূচি — আন্তর্জাতিক-এর নিয়মাবলীর মুখবন্ধ (১৮) — মার্কস রচনা করলেন এমন নিপুণ হাতে যে, বাকুনিন ও নৈরাজ্যবাদীরা পর্যন্ত তা স্বীকার করে। 'ইস্তাহার'-এ বর্ণিত নীতিগুলির শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবার ব্যাপারে মার্কস পুরোপুরি ও একান্তভাবে নির্ভর করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণির বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশের উপর, মিলিত লড়াই ও আলোচনা থেকে উদ্ভব অনিবার্য। পুঁজির সঙ্গে লড়াই-এর নানা ঘটনা ও বিপর্যয়, সাফল্যের চাইতে পরাজয়ই বেশি, সংগ্রামীদের কাছে প্রমাণ না করে পারে নি যে, তাদের আগেকার সর্বরোগহর দাওয়াইগুলি অকেজো, শ্রমিকদের মুক্তির সঠিক শর্তগুলি সম্যক উপলব্ধির পক্ষে তাদের মনকে তৈরি না করে পারে নি। মার্কস ঠিকই বুঝেছিলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সময়কার শ্রমিক শ্রেণির তুলনায় ১৮৭৪ সালে আন্তর্জাতিক উঠে

যাওয়ার সময়কার শ্রমিক শ্রেণি সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে ওঠে। লাতিন দেশগুলিতে প্রুধোঁবাদ ও জার্মানির স্বকীয় লাসালপন্থা তখন মরণোন্মুখ, এমন কি চরম রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলি পর্যন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল এমন একটা পর্যায়ে, যখন ১৮৮৭ সালে তাদের সোয়ানসি কংগ্রেসের সভাপতি* তাদের তরফ থেকে বলতে পারলেন যে : 'ইউরোপিয় মহাদেশের সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আর বিভীষিকা নেই।' অথচ ১৮৮৭ সালের ইউরোপিয় মহাদেশের সমাজতন্ত্র প্রায় পুরোপুরিই 'ইস্তাহার'-এর ঘোষিত তত্ত্ব মাত্র। সুতরাং, কিছুটা পরিমাণে, 'ইস্তাহার'-এর ইতিহাসে ১৮৪৮ সালের পরবর্তী আধুনিক শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের ইতিহাসটাই প্রতিফলিত। বর্তমানে সমগ্র সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত, সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সৃষ্টি, সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সকল দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সাধারণ কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা।

তবুও প্রথম প্রকাশের সময়ে আমরা একে সমাজতন্ত্রী ইস্তাহার বলতে পারতাম না। ১৮৪৭ সালে দুই ধরনের লোককে সমাজতন্ত্রী গণ্য করা হত। একদিকে ছিল বিভিন্ন ইউপোপিয় মতবাদের সমর্থকেরা, বিশেষ করে ইংলন্ডে ওয়েনপন্থী ও ফ্রান্সে ফুরিয়েপন্থীরা, অবশ্য ততদিনে উভয়েই সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। অন্যদিকে ছিল অনেক প্রকারের সামাজিক হাতুড়ে, যারা সামাজিক অবিচার দূর করতে চাইত নানাবিধ সর্বরোগহর দাওয়াই ও জোড়াতালি প্রয়োগ করে — পুঁজি ও মুনাফার বি(দুমাত্র ক্ষতি না করে। উভয় ক্ষেত্রেই এরা ছিল শ্রমিক আ(দোলনের বাইরের লোক এবং সমর্থনের জন্য তাকিয়ে ছিল বরং 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের দিকে। নিতান্ত রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয় — এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে শ্রমিক শ্রেণির যে অংশটি সেদিন সমাজের আমূল পুনর্গঠনের দাবি তোলে, তারা সে সময় নিজেদের কমিউনিস্ট বলত। তখন পর্যন্ত এটা ছিল অসংস্কৃত, নিতান্ত সহজপ্রবৃত্তিজাত, প্রায়শই অনেকটা স্থূল কমিউনিজম মাত্র। তবুও ইউটোপিয় কমিউনিজমের দুটি ধারাকে জন্ম দেবার মতো শক্তি এর ছিল — ফ্রান্সে কাবে-র 'আইকেরীয়' (Icarian) কমিউনিজম এবং জার্মানিতে ভাইটলিং-এর কমিউনিজম (১৯)। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝাত একটা বুর্জোয়া আ(দোলন, কমিউনিজম বোঝাত শ্রমিক আ(দোলন। ইউরোপিয় মহাদেশে অন্তত তখন সমাজতন্ত্র ছিল বেশ ভদ্রস্থ, আর কমিউনিজম চিল ঠিক তার বিপরীত। আর প্রথম থেকেই যেহেতু আমাদের অতি দৃঢ় মত ছিল যে, 'শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি শ্রমিক শ্রেণিরই নিজস্ব কাজ হতে হবে', তাই দুই নামের মধ্যে কোনটি বেছে নেব সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংশয় ছিল না। পরেও কখনো নাম বর্জন করার কথা আমাদের মনে আসে নি।

'দুনিয়ার মজুর এক হও!' — বিয়াল্লিশ বছর আগে এই কথাগুলি প্রথম প্যারিস বিপ্লবের প্রাক্কালে, যে-বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত তার নিজস্ব দাবি নিয়ে হাজির হয়, আমরা পৃথিবীর সামনে ঘোষণা করেছিলাম, তখন কিন্তু অতি অল্প কণ্ঠেই তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল। ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের প্রলেতারিয়রা 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিতে' হাত মেলায়, সমিতির স্মৃতি অতি গৌরবজনক। সত্য কথা, আন্তর্জাতিক বেঁচে ছিল মাত্র নয় বছর। কিন্তু সকল দেশের প্রলেতারিয়দের যে চিরন্তন ঐক্য এতে সৃষ্টি হয়েছিল, সে ঐক্য যে আজও জীবন্ত এবং আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, বর্তমান কালটাই তার সর্বোত্তম সাক্ষ্য। কেননা, আজ যখন আমি এই পঙ্‌ক্তিগুলি লিখছি তখন ইউরোপ ও আমেরিকার প্রলেতারিয়েত তাদের লড়বার শক্তি বিচার করে দেখছে, এই সর্বপ্রথম তারা সংঘবদ্ধ, সংঘবদ্ধ একটি বাহিনি রূপে, এক পতাকার নিচে, একটিই আশু লক্ষ্য নিয়ে : ১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে ও আবার ১৮৮৯ সালে প্যারিস শ্রমিক কংগ্রেসে যা ঘোষিত হয়েছিল সেইভাবে আইন পাশ করে সাধারণ আট ঘণ্টা কর্ম-দিবস চালু করতে হবে। আজকের দিনের দৃশ্য সকল দেশের পুঁজিপতি ও জমিদারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে, আজ সকল দেশের প্রলেতারিয়রা সত্যই এক হয়েছে।

নিজের চোখে তা দেখবার জন্য মার্কস যদি এখনও আমার পাশে থাকতেন!

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ১ মে, ১৮৯০

১৮৯২ সালের পোলিশ সংস্করণের ভূমিকা

'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর একটি নতুন পোলিশ সংস্করণের যে প্রয়োজন হল তাতে নানা কথা মনে আসে।

প্রথমত, 'ইস্তাহার'-টি যেন ইদানিং ইউরোপিয় মহাদেশের বৃহদায়তন শিল্পবিকাশের একটা সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক-একটি দেশে বৃহদায়তন শিল্প যে পরিমাণে বাড়ে, সেই পরিমাণেই মালিক শ্রেণিগুলির তুলনায় শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব শ্রেণিগত অবস্থান থেকে শিক্ষার জন্য আগ্রহ বাড়ে, তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং 'ইস্তাহার'-এর চাহিদা বাড়ে। তাই শুধু শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা নয়, প্রতি দেশে বৃহদায়তন শিল্প বিকাশের মাত্রাও বেশ সঠিকভাবে মাপা যায় সে দেশের ভাষায় 'ইস্তাহার'-এর কত কপির প্রচার হয়েছে তা দেখে।

সেই হিসাবে নতুন পোলিশ সংস্করণটি থেকে পোলিশ শিল্পের একটি নিশ্চিত অগ্রগতির সূচনা পাওয়া যাচ্ছে। দশ বছর আগে প্রকাশিত পূর্বেকার সংস্করণটির পরে যে এই প্রগতি সত্যই ঘটেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। রুশি পোল্যান্ড, কংগ্রেসি পোল্যান্ড (২০) হয়ে উঠেছে রুশ সাম্রাজ্যের বৃহৎ শিল্পাঞ্চল। রুশ বৃহদায়তন শিল্প খাপছাড়াভাবে ছড়ানো — ফিনল্যান্ড উপসাগরের পাশে একটা অংশ, আর একটা অংশ মধ্যাঞ্চলে (মস্কো ও ভ্লাদিমির), তৃতীয় অংশটা কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগরের উপকূলে, আরো কিছু অংশ অন্যত্র — কিন্তু পোলিশ শিল্প অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটা অঞ্চলে জমাট-বাঁধা এবং এরূপ ভাবে কেন্দ্রীভবন হওয়াতে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই হয়েছে। পোলিশ লোকেদের রুশিতে পরিণত করার ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও রুশ কারখানামালিকেরা যখন পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে রক্ষণমূলক শুল্কের দাবি জানায় তখন তারা ওই সুবিধার কথাটাই মানে। অসুবিধাটা পোলিশ কারখানামালিক ও রুশ সরকার উভয়ের পক্ষেই প্রকাশ পায় পোলিশ শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার দ্রুত প্রসারে ও 'ইস্তাহার'-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদায়।

কিন্তু রাশিয়াকে ছাড়িয়ে গিয়ে পোলিশ শিল্পের এই যে দ্রুত বিকাশ, সেটাই আবার পোলিশ জনগণের অফুরন্ত প্রাণশক্তির নতুন সাক্ষ্য এবং তার আসন্ন জাতীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার নতুন গ্যারান্টি। এবং স্বাধীন শক্তিশালী পোল্যান্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শুধু পোলিশ স্বার্থ নয়, আমাদের সকলেরই স্বার্থ। ইউরোপিয় জাতিগুলির একটা সাচ্চা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভব হতে পারে কেবল যদি এই প্রত্যেকটা জাতির স্বদেশে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন থাকে। ১৮৪৮ সালের যে-বিপ্লবে প্রলেতারিয় পতাকা তুলেও শেষ পর্যন্ত শুধু বুর্জোয়ার কাজটা করতে হয় প্রলেতারিয়েত যোদ্ধাদের, তাতেও ইতালি, জার্মানি ও হাঙ্গেরির স্বাধীনতা অর্জিত হয় তার দায়ভাগী ব্যবস্থাপক লুই বোনাপার্ট ও বিসমার্ক (২১) মারফত। কিন্তু ১৭৯২ সালের পর থেকে একা পোল্যান্ড এই তিনটে দেশের চাইতেও বিপ্লবের জন্য অনেক বেশি কিছু করলেও ১৮৬৩ সালে তর দশগুণ শক্তিশালী রুশি শক্তির কাছে হার মানবার সময়ে (২২) শুধু নিজের সম্পদের উপরেই ভরসা করতে হয় তাকে। অভিজাত সম্প্রদায় পোলিশ স্বাধীনতা বজায় রাখতেও পারত না, পুনরুদ্ধার করতেও পারত না, আজকে বুর্জোয়ার কাছে এ স্বাধীনতা, কম করে বললেও, তাৎপর্যহীন। তথাপি ইউরোপিয় জাতিগুলির সুষম সহযোগিতার জন্য তার প্রয়োজন আছে।* তা অর্জন করতে পারে কেবল নবীন পোলিশ প্রলেতারিয়েত এবং তার হাতেই এই স্বাধীনতা নিরাপদ। কেননা, ইউরোপের বাকি অংশের শ্রমিকদের পক্ষে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা খোদ পোলিশ শ্রমিকদের মতোই প্রয়োজনীয়।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস
লন্ডন, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২

* পোলিশ সংস্করণে এই বাক্যটি নেই। — সম্পাঃ

১৮৯৩ সালের ইতালিয় সংস্করণের ভূমিকা
ইতালিয় পাঠকদের প্রতি

‘কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার’ প্রকাশের সঙ্গে মিলান ও বার্লিনে বিপ্লবের তারিখ, ১৮ মার্চ, ১৮৪৮-এর, বলা যেতে, পারে, সমাপতন ঘটেছিল, এই বিপ্লব ছিল ইউরোপিয় মহাদেশের মধ্যস্থলে একটি এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যস্থলে অবস্থিত আর একটি, দুটি জাতির সশস্ত্র অভ্যুত্থান, দুটি জাতিই বিভাগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তখনও পর্যন্ত দুর্বল হয়ে ছিল এবং এই কারণে বৈদেশিক প্রভুত্বের অধীন হয়। ইতালি ছিল অস্ট্রিয় সম্রাটের অধীন, আর জার্মানি পরোক্ষভাবে হলেও বহন করত পুরো রুশ দেশিয় জারের সমানভাবে কার্যকর জোয়াল। ১৮৪৮ সালের ১৮ মার্চের ঘটনাবলীর ফলে ইতালি ও জার্মানি উভয়েই এ লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পায়, ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে এ দুটি মহা জাতি যদি পুনর্গঠিত হয়ে কিছুটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরে থাকে, তবে তার কারণ, কার্ল মার্কস যা বলতেন, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবকে যারা দমন করে তারাই কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছিল তার দায়ভাগী ব্যবস্থাপক।

সর্বত্র এ বিপ্লব করেছে শ্রমিক শ্রেণি : এরাই ব্যারিকেড গড়ে, রক্ত ঢেলে মূল্য দেয়। সরকার উচ্ছেদের সময়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকেও উচ্ছেদ করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় ছিল কেবল প্যারিস শ্রমিকদের। কিন্তু স্বশ্রেণির সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণির মারাত্মক বৈরিতার বিষয়ে তারা সচেতন থাকলেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অথবা ফরাসি শ্রমিক সাধারণের বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশ সে পর্যায়ে পৌঁছয় নি যাতে একটা সামাজিক পুনর্গঠন সম্ভব হয়। তাই শেষ বিচারে, বিপ্লবের সুফল ভোগ করে পুঁজিপতি শ্রেণি। অন্যান্য দেশে, ইতালিতে, জার্মানিতে, অস্ট্রিয়ায় শ্রমিকেরা প্রথম থেকেই বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় বসানো ছাড়া আর কিছু করে নি। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা ছাড়া কোনো দেশেই বুর্জোয়ার শাসন সম্ভব নয়। তাই, তখনও পর্যন্ত যেসব জাতির ঐক্য ও স্বায়ত্তশাসন ছিল না তাদের জন্য ১৮৪৮ সালের বিপ্লবকে তা এনে দিতে হয়, যথা ইতালি, জার্মানি, হাঙ্গেরি। এরপর পালা আসবে পোল্যান্ডের।

১৮৪৮ সালের বিপ্লব তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য তা রাস্তা বেঁধে দেয়, জমি তৈরি করে। সমস্ত দেশে বৃহদায়তন শিল্পকে প্রেরণা দিয়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থা গত পঁয়তাল্লিশ বছরে একটা অগণিত পুঞ্জীভূত ও শক্তিশালী প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করেছে। ‘ইস্তাহার’-এর ভাষায় বলতে গেলে, এ গড়ে তুলেছে তাদের, যারা তাকে কবর দেবে। প্রতিটি জাতির স্বায়ত্তশাসন ও ঐক্য পুনরুদ্ধার না করে প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক মিলন অথবা সাধারণ লক্ষ্যে এই সব জাতির শান্তিপূর্ণভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সহযোগিতা অসম্ভব হবে। ১৮৪৮ সালের আগেকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইতালিয়, হাঙ্গেরিয়, জার্মান, পোলিশ ও রুশ শ্রমিকদের মিলিত একটা আন্তর্জাতিক সংগ্রাম কল্পনা করা যায় কি!

তাই, ১৮৪৮ সালের লড়াইগুলো বৃথা লড়া হয় নি। সে বিপ্লবী যুগ থেকে আজ আমাদের যে পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান, তাও অযথা কাটে নি। ফল পেকে উঠেছে এবং একান্তভাবে কামনা করি যে, মূল ‘ইস্তাহার’ প্রকাশ যেমন আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিজয় সূচিত করেছিল, তার এই ইতালিয় অনুবাদ প্রকাশও যেন সেইভাবে ইতালিয় প্রলেতারিয়েতের বিজয় সূচিত করে।

অতীতে পুঁজিতন্ত্র যে বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েছিল তার প্রতি পূর্ণ সুবিচার করেছে ‘ইস্তাহার’। প্রথম পুঁজিতান্ত্রিক দেশ ছিল ইতালি। সামন্ত মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক যুগের উদ্বোধনক্ষণ চিহ্নিত এক মহাপুরুষের মূর্তিতে, তিনি ইতালিয় দান্তে, যুগপৎ তিনি মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক কালের প্রথম কবি। ১৩০০ সালের মতোই আজ এক নতুন ঐতিহাসিক যুগ এগিয়ে আসছে। ইতালি কি আমাদের এক নতুন দান্তে দেবে, যে সূচিত করবে এই নতুন প্রলেতারিয় যুগের জন্মলগ্ন ?

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস
লন্ডন, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার

ইউরোপকে আতঙ্কগ্রস্ত করছে একটা ভূত — কমিউনিজমের ভূত। এই ভূত ছাড়াবার জন্য এক পবিত্র জোটের মধ্যে এসে ঢুকেছে সাবেকি ইউরোপের সকল শক্তি — পোপ এবং জার, মেটেরনিখ ও গিজো (২৩), ফরাসি র‍্যাডিক্যালেরা আর জার্মান পুলিসগোয়েন্দারা।

এমন কোন বিরোধী পার্টি আছে, ক্ষমতায় আসীন প্রতিপক্ষ যাকে কমিউনিস্ট-ভাবপন্ন বলে নিন্দা করে নি? এমন বিরোধী পার্টিই বা কোথায় যে নিজেও আরও অগ্রসর বিরোধী দলগুলির, তথা প্রতিক্রিয়াশীল বিপক্ষদের বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেয় নি কমিউনিজমের অপবাদসূচক গালি?

এই ঘটনা থেকে দুটি জিনিস বেরিয়ে আসে :

১। ইউরোপের সকল শক্তি ইতিমধ্যেই কমিউনিজমকে একটা শক্তি হিসেবে স্বীকার করেছে।

২। সময় এসে গেছে যখন প্রকাশ্যে, সারা জগতের সামনে কমিউনিস্টদের ঘোষণা করা উচিত তাদের মতামত কী, লক্ষ্য কী, তাদের ঝোঁক কোন দিকে, এবং কমিউনিজমের ভূতের এই ছেলে-ভোলানো গল্পের জবাব দেওয়া উচিত পার্টির একটা ইস্তাহার দিয়েই।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে নানা জাতির কমিউনিস্টরা লন্ডনে সমবেত হয়ে নিম্নলিখিত 'ইস্তাহারটি' প্রস্তুত করেছে, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়, ফ্লেমিশ এবং ডেনিশ ভাষায় এটি প্রকাশিত হবে।

১
বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত*

আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাসই শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস।**

স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্‌ড্‌-কর্তা*** আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারি এবং অত্যাচারিতরা সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে, প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে অথবা সমস্ত দ্ব(দ্বরত শ্রেণির ধ্বংসের মধ্যে।

ভূতপূর্ব ঐতিহাসিক যুগগুলিতে প্রায় সর্বত্র আমরা দেখি সমাজে বিভিন্ন বর্গের একটা জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদমর্যাদার নানাবিধ ধাপ। প্রাচীন রোমে ছিল প্যাট্রিশিয়ান, যোদ্ধা (knights), প্লিবিয়ান এবং ক্রীতদাসেরা, মধ্যযুগে ছিল সামন্ত প্রভু, অনু-সামন্ত (vassals), গিল্‌ড্‌কর্তা, কারিগর, শিক্ষানবিস কারিগর এবং ভূমিদাস, তা ছাড়া এইসব শ্রেণির প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে আবার অভ্যন্তরীণ স্তরভেদ।

সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে, তা শ্রেণিবিরোধ দূর করে নি। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণি, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, সংগ্রামের পুরনো ধরনের বদলে নতুন ধরন।

আমাদের যুগ, অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে : শ্রেণিবিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল শত্রুশিবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণিতে : বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।

মধ্যযুগের ভূমিদাসদের ভিতর থেকে প্রথম দিকের শহরগুলির স্বাধীন নাগরিকদের (chartered burghers) উদ্ভব হয়। এই নাগরিকদের মধ্যে থেকে আবার বুর্জোয়া শ্রেণির প্রথম উপাদানগুলি বিকশিত হল।

আমেরিকা আবিষ্কার ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণের ফলে উঠতি বুর্জোয়াদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে গেল। পূর্ব ভারত ও চিনের বাজার, আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন, উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিময়-ব্যবস্থার তথা সাধারণভাবে পণ্যের প্রসার — বাণিজ্যে, নৌযাত্রায় ও শিল্পে দান করে অজ্ঞাতপূর্ব একটা উদ্যোগ এবং তার দ্বারা টলায়মান সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ বৈপ্লবিক উপাদানগুলির জন্য এনে দেয় দ্রুত একটা বিকাশ।

* বুর্জোয়া বলতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণিকে বোঝায়, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক এবং মজুরি-শ্রমের নিয়োগকর্তা। প্রলেতারিয়েত হল আজকালকার মজুরি-শ্রমিকেরা, উৎপাদনের উপায় নিজেদের হাতে না থাকার দরুন যারা বেঁচে থাকার জন্য স্বীয় শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয়। (১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

** অর্থাৎ সমগ্র লিখিত ইতিহাস। ১৮৪৭ সালে সমাজের প্রাক্‌-ইতিহাস, লিখিত ইতিহাসের পূর্ববর্তী কালের সামাজিক সংগঠনের বিবরণ প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। তারপরে, হাক্‌স্টহাউজেন (২৪) রাশিয়ায় জমির উপর যৌথ মালিকানা আবিষ্কার করেন, মাউরার (২৫) প্রমাণ করেন যে, সকল টিউটনিক জাতির ইতিহাস শুরু হয় এই সামাজিক ভিত্তি থেকে, ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে ভারত থেকে আয়ার্ল্যান্ড পর্যন্ত সর্বত্র গ্রাম-গোষ্ঠিই (Village communities) সমাজের আদি রূপ ছিল কিংবা রয়েছে। গোত্রের (gens) আসল প্রকৃতি এবং উপজাতির (tribe) সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে মর্গানের (২৬) চূড়ান্ত আবিষ্কার এই আদিম কমিউনিস্ট ধরনের সমাজের ভিতরকার সংগঠনের বিশিষ্ট রূপটি খুলে ধরল। এই আদিম গোষ্ঠীগুলি ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন এবং শেষ পর্যন্ত পরস্পরবিরোধী শ্রেণিতে বিভক্ত হতে শুরু করে। এই ভাঙনের ধারাটা আমি অনুসরণের চেষ্টা করেছি আমার (Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats) ('পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থটিতে, দ্বিতীয় সংস্করণ, স্টুটগার্ট, ১৮৮৬)। (১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

*** গিল্‌ড্‌কর্তা, অর্থাৎ গিল্‌ড্‌ সঙ্ঘের পূর্ণ সদস্য, গিল্‌ডের অন্তর্ভূক্ত কর্তা, উপরিস্থিত প্রভু নয় (১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

সামন্ত শিল্প-ব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদনের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল গণ্ডিবদ্ধ গিল্‌ডগুলির হাতে, নতুন বাজারের চাহিদার পক্ষে এখন তা আর পর্যাপ্ত নয়। তার জায়গায় এলো হস্তশিল্প কারখানা। কারখানাজীবী মধ্য শ্রেণি ঠেলে সরিয়ে দিল গিল্‌ড্‌কর্তাদের। বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট গিল্‌ডের মধ্যেকার শ্রমবিভাগ মিলিয়ে গেল একই কর্মশালার ভিতরকার শ্রমবিভাগের সামনে।

এদিকে বাজার বাড়তেই থাকে, চাহিদা বাড়তে থাকে। হস্তশিল্প কারখানাতেও আর কুলাল না। অতঃপর বাষ্প ও যন্ত্রশিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে দিল শিল্পোৎপাদনে। হস্তশিল্প কারখানার জায়গা নিল শিল্পজীবী লাখপতি, এক-একটা গোটা শিল্পবাহিনির হর্তাকর্তা, আধুনিক বুর্জোয়া।

আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছে বিশ্ববাজার, যার পথ পরিষ্কার করেছিল আমেরিকা আবিষ্কার। এ বাজারের ফলে বাণিজ্য, নৌযাত্রা ও স্থলপতে যোগাযোগের প্রভূত বিকাশ ঘটছে। সে বিকাশ আবার প্রভাবিত করেছে শিল্পপ্রসারকে, এবং যে অনুপাতে শিল্প, বাণিজ্য, নৌযাত্রা ও রেলপথের প্রসার, সেই অনুপাতেই বিকশিত হয়েছে বুর্জোয়া, বাড়িয়ে তুলেছে তার পুঁজি, মধ্যযুগ থেকে আগত সমস্ত শ্রেণিকেই পেছনে ঠেলে দিয়েছে।

তা হলে আমরা দেখছি, আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেই একটা দীর্ঘ বিকাশধারার ফল, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির এক প্রস্ত বিপ্লবের পরিণতি।

বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সমানে চলেছিল সে শ্রেণির রাজনৈতিক অগ্রগতি। এই যে বুর্জোয়ারা ছিল সামন্ত প্রভুদের আমলে একটা নিপীড়িত শ্রেণি, মধ্যযুগের কমিউনে* যারা দেখা দেয় একটা সশস্ত্র ও স্বশাসিত সংঘ রূপে, কোথাও বা স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র (যেমন ইতালি ও জার্মানিতে), আবার কোথাও বা রাজতন্ত্রের করদাতা 'তৃতীয় মণ্ডলী' রূপে (যেমন ফ্রান্সে), তারপর হস্তশিল্প পদ্ধতির প্রকৃত পর্বে যারা আধা সামন্ততান্ত্রিক বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সেবা করে অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে সমভার শক্তি হিসেবে, এবং বস্তুতপক্ষে সাধারণভাবে বৃহৎ রাজতন্ত্রগুলির স্তম্ভ হিসেবে, সেই বুর্জোয়া শ্রেণি অবশেষে আধুনিক শিল্প ও বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠার পর, আজকালকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের জন্য পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করে নিয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণির সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার একটা কমিটি মাত্র।

ঐতিহাসিকভাবে, বুর্জোয়া শ্রেণি খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে।

বুর্জোয়া শ্রেণি যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যেসব বিচিত্র সামন্ত-বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বতনদের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের নগ্ন স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ দেনাপাওনার' সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই এরা অবশিষ্ট রাখে নি। আত্মসর্বস্ব হিসাবনিকাশের ঠান্ডা জলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ ও কূপমণ্ডুক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময়মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থলে এরা এনে খাড়া করেছে ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা — অবাধ বাণিজ্য। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মোহগ্রস্ততার মধ্যে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ, পাশবিক শোষণ।

মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী — সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরিভোগী শ্রমজীবী রূপে।

* ফ্রান্সে নবোদ্ভূত শহরগুলি সামন্ত মনিব ও প্রভুদের কাছ থেকে স্থানীয় স্বশাসন ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে 'তৃতীয় মণ্ডলী' (Third Estate) রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই 'কমিউন' নাম গ্রহণ করে। সাধারণভাবে বলা চলে যে, বুর্জোয়া শ্রেণির অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এখানে ইংলন্ডকে আদর্শ দেশ হিসেবে ধরা হয়েছে, রাজনৈতিক বিকাশের বেলা ফ্রান্সকে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ইতালি ও ফ্রান্সের শহরবাসীরা তাদের সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে আত্মশাসনের প্রাথমিক অধিকার কিনে অথবা কেড়ে নেবার পর নিজেদের নগর-সমাজের এই নাম দিয়েছিল। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

বুর্জোয়া শ্রেণি পরিবার প্রথা থেকে তার ভাবালু আবরণকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে নামিয়ে এনেছে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে।

মধ্যযুগে শক্তির যে পাশবিক প্রকাশকে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এতটা মাথায় তোলে, তারই যোগ্য পরিপূরক হিসেবে চূড়ান্ত অলস নিষ্ক্রিয়তা কি করে সম্ভব হয়েছিল তা বুর্জোয়া শ্রেণিই ফাঁস করে দেয়। এরাই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছে মানুষের উদ্যমে কি হতে পারে। এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের পয়ঃপ্রণালী এবং গথিক গির্জাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এদের পরিচালিত অভিযানে অতীতের সকল জাতির দলবদ্ধ দেশান্তর যাত্রা ও ধর্মযুদ্ধকে (crusades)(27) ম্লান করে দিয়েছে।

উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে এবং তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্ক ও সেইসঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি বাঁচতে পারে না। অপরপক্ষে অতীতের শিল্পজীবী সকল শ্রেণির বেঁচে থাকার প্রথম শর্তই ছিল সাবেকি উৎপাদনপদ্ধতির অপরিবর্তিত রূপটা বজায় রাখা। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং আলোড়ন। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভারাক্রান্ত কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়, নবগঠিত সম্পর্ক ইত্যাদি দৃঢ়সম্বন্ধ হয়ে উঠবার আগেই সেকেলে হয়ে আসে। যা কিছু সারবান তা-ই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা পবিত্র তা হয় কলুষিত, শেষ পর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে খোলা চোখে দেখতে।

নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত প্রসারমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেকিে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।

বুর্জোয়া শ্রেণি বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগ্য-ব্যবস্থাতে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই জাতিগত ভূমিটা যার উপর শিল্প আগে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত সাবেকি জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস হয়েছে নয় প্রত্যহ ধ্বংস হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প, যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই জীবনমরণের প্রশ্নের শামিল, এমন সব শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয় সুদূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করছে, এমন সব শিল্পর যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, দুনিয়ার সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সুদূর দেশ বিদেশের ও নানা আবহাওয়ার অবস্থাতে উৎপন্ন সামগ্রী। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর-নির্ভরতা। বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষেত্রেও। এক-একটা জাতির বুদ্ধিবৃত্তিগত সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি। জাতিগত একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে, অসংখ্য জাতীয় বা স্থানীয় সাহিত্য থেকে উদ্ভূত হয় একটা বিশ্বসাহিত্য।

সকল উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সকল, এমনকি অসভ্যতম জাতিদেরও টেনে আনছে সভ্যতার আওতায়। যে ভারী কামান দেগে সে সমস্ত চিনা প্রাচীর চূর্ণ করে, বর্বর জাতিদের অতি একরোখা বিজাতি-বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে, তা হল তার পণ্যের শস্তা দর। অন্যথায় বিলুপ্তির ভয় দেখিয়ে সকল জাতিকে বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালী গ্রহণে তারা বাধ্য করে, বাধ্য করে সেই বস্তু চালু করতে যাকে তারা বলে সভ্যতা — অর্থাৎ বাধ্য করে তাদের বুর্জোয়া বনতে। এককথায়, বুর্জোয়া শ্রেণি তার নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে।

গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণি শহরের পদানত করেছে। সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর, এবং এইভাবে জনগণের এক বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে গ্রামজীবনের মূঢ়তা থেকে। গ্রামাঞ্চলকে এরা যেমন শহরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছে, ঠিক তেমনই বর্বর বা অর্ধ-বর্বর দেশগুলিকে সভ্য

দেশের, কৃষিপ্রধান জাতিগুলিকে বুর্জোয়া-প্রধান জাতির, প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের উপরে নির্ভরশীল করে তুলেছে।

জনসমষ্টির, উৎপাদনের উপকরণের এবং সম্পত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়া শ্রেণি ক্রমশই ঘুচিয়ে দিতে থাকে। জনসমষ্টিকে এরা পুঞ্জিভূত করেছে, উৎপাদনের উপকরণগুলি করেছে কেন্দ্রীভূত, সম্পত্তিকে জড়ো করেছে অল্প লোকের হাতে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ, আইনকানুন, শাসনব্যবস্থা অথবা করপ্রথা সম্বলিত স্বতন্ত্র কিংবা শিথিলভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলিকে ঠেসে মেলানো হয় এক-একটা জাতিতে যাদের একই শাসনযন্ত্র, একই আইন-সংহিতা, একই জাতীয় শ্রেণি-স্বার্থ, একই সীমান্ত এবং একই শুল্কব্যবস্থা।

তার আধিপত্যের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে না হতে, বুর্জোয়া শ্রেণি যে উৎপাদন-শক্তি সৃষ্টি করেছে তা সকল পূর্ববর্তী প্রজন্মের উৎপাদন-শক্তির চেয়েও আকারে ও পরিধিতে অনেক বেশি বড়ো। প্রকৃতির শক্তিরকে মানুষের কর্তৃত্বাধীন করা, যন্ত্রের ব্যবহার, শিল্প ও কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, বাষ্পশক্তির সাহায্যে জলযাত্রা, রেলপথ, ইলেকট্রিক, টেলিগ্রাফ, চাষবাসের জন্য গোটা এক-একটা মহাদেশ সাফ করে ফেলা, জলযাত্রার জন্য নদীর খাল কাটা, ভেলকিবাজির মতো যেন মাটি ফুঁড়ে পুরো একটা জনসমষ্টির আবির্ভাব — সামাজিক শ্রমের কোলে যে এতখানি উৎপাদন-শক্তি সুপ্ত ছিল, আগেকার কোনো শতক কি তার পূর্বাভাসটুকুও ধরতে পেরেছিল ?

আমরা তা হলে দেখলাম : উৎপাদন ও বিনিময়ের যে সব উপায়কে ভিত্তি করে বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের গড়ে তুলেছিল, সেগুলির উৎপত্তি সামন্ত সমাজের মধ্যে। উৎপাদন ও বিনিময়ের এই সব উপায়ের বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায় এল যখন সামন্ত সমাজের উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্ত, কৃষি ও হস্তশিল্প কারখানার সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন, এক কথায় মালিকানার সামন্ত সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গো খাপ খেল না। উৎফাদনে বিকাশের পরিবর্তে এগুলি উৎপাদনে বাধা হল। এগুলি তখন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে শৃঙ্খল ভাঙতে হত এবং তা ভেঙে ফেলা হল।

তাদের জায়গায় এগিয়ে এল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেইসঙ্গো তারই উপযোগী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

আমাদের চোখের সামনে আজ অনুরূপ আর-এক ধারা চলেছে। নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক ও মানিকানা-সম্পর্ক সহ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ ভোজাবাজির সাহায্যে উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিশাল উপকরণ গড়ে তুলেছে, তার অবস্থা যেন সেই জাদুকরের মতো যে জাদুমন্ত্রে পাতালপুরির শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত বহু দশক ধরে শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু উৎপাদনের আধুনিক হালচালের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব ও আধিপত্যের জন্য যে মালিকানা-সম্পর্ক প্রয়োজন তার বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার আরো বেশি করে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, তার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সব সংকটে শুধু যে উপস্থিত উৎপন্নের অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তির অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস পায়। এই সব সংকটের ফলে এক মহামারী হাজির হয়, আগেকার সমস্ত যুগে যা অসম্ভব বলে গণ্য করা হত — এই মহামারী অতি-উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়, মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল জীবনধারণের সমস্ত উপকরণ-সরবরাহের পথ, শিল্প, বাণিজ্য যেন নষ্ট হয়ে গেল, এবং কী কারণে ? কারণ, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে, জীবনধারণের সামগ্রীর দেখা দিয়েছে অতিপ্রাচুর্য, অনেক বেশি হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বেশি বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শক্তি আছে, বুর্জোয়া মালিকানার বিকাশের জন্য তা আর সাহায্য করছে না, বরং যে অবস্থার মধ্যে এই শক্তি শৃঙ্খলিত ছিল তার তুলনায় এ শক্তি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রবল, শৃঙ্খলের বাধা কাটিয়ে ওঠা মাত্র সমস্ত বুর্জোয়া সমাজে এই শক্তি এনে ফেলে বিশৃঙ্খলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়োই সংকীর্ণ। এই সংকট থেকে বুর্জোয়া শ্রেণি আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায় ? একদিকে, উৎপাদন-শক্তির বিপুল অংশ নষ্ট করে ফেলতে বাধ্য হয়ে, অপরদিকে, নতুন বাজার দখল করে এবং পুরনো

বাজারের উপর আরও ব্যাপক শোষণ চালিয়ে। অর্থাৎ বলা যায় যে, আরও ব্যাপক ও আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকেই কমিয়ে এনে।

যে অস্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ বুর্জোয়া শ্রেণির নিজেরই বিরুদ্ধে উদ্যত।

যাতে বুর্জোয়া শ্রেণির মৃত্যুবাণ রয়েছে, শুধু সেই অস্ত্রটুকুই সে গড়ে নি, এমন লোকও সে সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সৃষ্টি করেছে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণি, প্রলেতারিয়দের।

যে পরিমাণে বুর্জোয়া শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ পায় প্রলেতারিয়েত, আধুনিক শ্রমিক শ্রেণি, মেহনতিদের এ শ্রেণিটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর কাজ জোটে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের পরিশ্রমে পুঁজি বাড়তে থাকে। এই মেহনতিদের নিজেদের টুকরো টুকরো করে বেচতে হয়, বাণিজ্যের অন্য সামগ্রীর মতোই তারা পণ্যদ্রব্যের শামিল আর সেই হেতু নিয়তই প্রতিযোগিতার সবকিছু ঝড়-ঝাপটা, বাজারের সবরকম ওঠানামার অধীন তারা।

যন্ত্রের বহুল ব্যবহার এবং শ্রমবিভাগের ফলে প্রলেতারিয়দের কাজ আজ সকল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে, এবং সেই হেতু মজুরের কাছে কাজের আকর্ষণ লোপ পেয়েছে। মজুর হয়ে ওঠে যন্ত্রের এক উপাঙ্গ, তার কাছ থেকে অতি সাধারণ, একান্ত একঘেয়ে, অতি সহজে অর্জনীয় যোগ্যতাটুকু পেলেই চলে। সুতরাং একজন মজুরের উৎপাদন-ব্যয়টা প্রায় একান্তই তাকে বাঁচিয়ে রাখার ও তার বংশরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পণ্যের দাম, অতএব শ্রমেরও দাম (২৮) তার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। সুতরাং কাজের বিকর্ষণ যত বাড়ে, মজুরি তত কমে। শুধু তাই নয়, যে পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রমবিভাগ বাড়ে, সেই অনুপাতে বাড়ে কাজের বোঝা, হয় খাটুনির ঘন্টা বাড়িয়ে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বেশি কাজ আদায় করে অথবা যন্ত্রের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে, ইত্যাদি।

আধুনিক যন্ত্রশিল্প গোষ্ঠীপতি ধরনের মালিকের ছোটো কর্মশালাকে শিল্প-পুঁজিপতির বিরাট ফ্যাক্টরিতে পরিণত করেছে। বিপুল সংখ্যায় মজুরকে ফ্যাক্টরির মধ্যে ভিড় করে ঢুকিয়ে সংগঠিত করা হয় সৈনিকের ধরনে। শিল্প-বাহিনির সাধারণ সৈন্য হিসেবে তারা থাকে অফিসার ও সার্জেন্টদের এক নিখুঁত ধাপে ধাপে সাজানো কর্তৃত্বের অধীনে। মজুরেরা কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণির ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস নয়, দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তাদের করা হচ্ছে যন্ত্রের দাস, পরিদর্শকের দাস, সর্বোপরি খাস বুর্জোয়া মালিকটির দাস। যথেচ্ছাচার যত খোলাখুলিভাবে মুনাফা লাভকেই নিজের লক্ষ্য ও আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করে ততই তা হয়ে ওঠে আরও হীন, আরও ঘৃণ্য, আরও তিক্ত।

শারীরিক মেহনতে দক্ষতা ও শক্তি যতই কম লাগতে থাকে, অন্যভাবে বলতে গেলে আধুনিক যন্ত্রশিল্প যতই বিকশিত হয়ে ওঠে, ততই পুরুষের পরিশ্রমের স্থান জুড়ে বসতে থাকে নারীর শ্রম। শ্রমিক শ্রেণির কাছে বয়স কিংবা নারী-পুরুষের তফাতটার এখন আর বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য নেই। সকলেই তারা খাটবার যন্ত্রমাত্র, বয়স অথবা নারী-পুরুষের তফাত অনুসারে যন্ত্র ব্যবহারের খরচটুকু কিছু বাড়ে-কমে মাত্র।

শিল্পের মালিক কর্তৃক মজুরের শোষণ খানিকটা শেষ হওয়া মাত্র, অর্থাৎ তার মজুরির টাকাটা পাওয়া মাত্র, তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণির অন্যান্য অংশ — বাড়িওয়ালা, দোকানদার, বন্ধকী কারবারি প্রভৃতি।

মধ্য শ্রেণির নিম্ন স্তর — ছোটোখাট ব্যবসায়ী, দোকানদার, সাধারণত ভূতপূর্ব কারবারী, হস্তশিল্পী এবং চাষিরা — এরা সবাই ধীরে ধীরে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নেমে আসে, তার অন্যতম কারণ, যতখানি বড়ো আয়তনে আধুনিক শিল্প চালাতে হয় এদের সামান্য পুঁজি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং প্রতিযোগিতায় বড়ো পুঁজিপতিরা এদের গ্রাস করে ফেলে, অপর কারণ, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির ফলে এদের বিশিষ্ট নৈপুণ্যটুকু অকেজো হয়ে যায়। সুতরাং জনসমষ্টির প্রতিটি শ্রেণি থেকে আগত লোকের দ্বারা প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা-বৃদ্ধি হতে থাকে।

বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে যেতে হয়। বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম শুরু হয় জন্মমুহূর্ত থেকে।

প্রথমটা লড়াই চালায় এককভাবে মজুরেরা, তারপর লড়তে থাকে গোটা ফ্যাক্টরির মেহনতিরা, তারপর কোনো একটা অঞ্চলের একই পেশায় নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিক তাদের সাক্ষাৎ শোষণকারী বিশিষ্ট পুঁজিপতিটির বিরুদ্ধে লড়ে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থাটা নয়, যে আমদানি মাল তাদের মহেনতের প্রতিযোগিতা করে সেগুলি তারা ধ্বংস করে, কলকবজা ভেঙে চুরমার করে দেয়, কারখানায় আগুন লাগায়, মধ্যযুগের মেহনতকারীর যে মর্যাদা লোপ পেয়েছে, গায়ের জোরে তা ফিরিয়ে আনতে চায়।

এই পর্যায়ে মজুরেরা তখনও দেশময় ছড়ানো এলোমেলো জনতামাত্র, পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ছত্রভঙ্গ। কোথাও যদি তারা অধিকতর সংহত সংস্থায় একজোটও হয়, তবু সেটা তখনও নিজস্ব সক্রিয় সম্মিলনের ফল, বরং বুর্জোয়া শ্রেণির সম্মিলনের ফলমাত্র, যে শ্রেণি নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গোটা প্রলেতারিয়েতকে সচল করতে বাধ্য হয়, এবং তখনও কিছুদিনের জন্য সে চেষ্টায় সফলও হয়। সুতরাং এই পর্যায়ে প্রলেতারিয়রা লড়ে নিজেদের শত্রুর বিপক্ষে নয়, শত্রুর শত্রু, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ, জমিদার, শিল্পবহির্ভূত বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় ইতিহাসের সমস্ত গতিটি বুর্জোয়া শ্রেণির হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে, এভাবে অর্জিত প্রতিটি জয় হল বুর্জোয়া শ্রেণির জয়।

কিন্তু যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েত কেবল সংখ্যায় বাড়ে না, তারা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে বৃহত্তর সমষ্টিতে, তাদের শক্তি বাড়তে থাকে, আপন শক্তি তারা বেশি করে উপলব্ধি করে। যন্ত্রপাতি যে অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের পার্থক্য মুছে ফেলতে থাকে আর প্রায় সর্বত্র মজুরি কমিয়ে আনে একই নিচু স্তরে, সেই অনুপাতে প্রলেতারিয়েত বাহিনির মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ ও জীবনযাত্রার অবস্থা ক্রমেই সমান হয়ে যেতে থাকে। বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং তার ফলস্বরূপ বাণিজ্য-সংকটে শ্রমিকদের মজুরি আরও বেশি ওঠা-নামা করে। যন্ত্রে অবিরাম উন্নতি ক্রমেই আরো দ্রুত লয়ে বাড়তে থাকায়, তাদের জীবিকা হয়ে পড়ে আরও বিপন্ন, ব্যক্তিগতভাবে আলাদা আলাদা মজুরদের সঙ্গে এক-একজন বুর্জোয়ার সংঘর্ষ ক্রমেই বেশি করে দুই শ্রেণির সংঘর্ষের রূপ নেয়। তখন মজুরেরা মিলিত সমিতি গঠন শুরু করে (ট্রেড ইউনিয়ন) বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে, মজুরির হার বজায় রাখার জন্য জোট বেঁধে দলবদ্ধ হয়, মাঝে-মধ্যে ঘটা এইসব বিদ্রোহের আগে থাকতে প্রস্তুতির জন্য স্থায়ী সংগঠন গড়ে। এখানে ওখানে দ্বন্দ্ব পরিণত হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে।

মাঝে মাঝে শ্রমিকেরা জয়ী হয়, কিন্তু কেবল অল্পদিনের জন্য। তাদের সংগ্রামের আসল লাভ আশু ফলাফলে নয়, মজুরদের ক্রমবর্ধমান সম্মিলনে। আধুনিক শিল্প যে উন্নত ধরনের যোগাযোগ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে এবং যাতে বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে — তা সাহায্য করে এই সম্মিলন ঘটাতে। একই চরিত্রের অসংখ্য স্থানীয় লড়াইকে শ্রেণিসমূহের মধ্যে একটা জাতিব্যাপী সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করার জন্য ঠিক এই সংযোগটারই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা শ্রেণি-সংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রাম। এক শহর থেকে আর এক শহরে যাওয়ার রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার দরুন যে সংহতি আনতে মধ্যযুগের নাগরিকদের শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগেছিল, আধুনিক শ্রমিকেরা তা অর্জন করে রেলপথের কল্যাণে মাত্র কয়েক বছরে।

প্রলেতারিয়দের শ্রেণি হিসেবে সংগঠিত হওয়া এবং তার ফল-স্বরূপ একটি রাজনৈতিক পার্টিতে সংগঠিত হওয়া ক্রমাগতই শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে ঘা খাচ্ছে। কিন্তু প্রতিবারই প্রবলতর, দৃঢ়তর, আরও শক্তিশালী হয়ে সংগঠন মাথা তোলে। বুর্জোয়া শ্রেণিরই মধ্যে বিভেদের সুযোগ নিয়ে তা শ্রমিকদের বিশেষ বিশেষ স্বার্থের আইনগত স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। ইংলন্ডে দশ ঘণ্টা কর্ম-দিবসের আইন এইভাবে পাশ হয়েছিল।

মোটের উপর, পুরনো সমাজের নানা শ্রেণির মধ্যে সংঘাত প্রলেতারিয়েতের বিকাশের পথে নানাভাবে সাহায্য করে। বুর্জোয়া শ্রেণিকে লিপ্ত থাকতে হয় অবিরাম সংগ্রামে। প্রথমে লড়াই হয় অভিজাতদের সঙ্গে, পরে বুর্জোয়া শ্রেণিরই যে যে অংশের স্বার্থ যন্ত্রশিল্প বিস্তারের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে, আর সর্বদাই বিদেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এই সব সংগ্রামেই বুর্জোয়াদের বাধ্য হয়ে শ্রমিক শ্রেণির কাছে আবেদন করতে হয়, সাহায্য চাইতে হয় তাদেরই কাছে, এভাবে তাদের টেনে আনতে হয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে। সুতরাং বুর্জোয়ারা

নিজেরাই প্রলেতারিয়েতকে তাদের রাজনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার কিছুটা উপাদান যোগাতে থাকে, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়বার অস্ত্র প্রলেতারিয়েতকে তারাই যোগায়।

এছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে, শিল্পের অগ্রগতির ফলে শাসক শ্রেণি মধ্য থেকে পুরো এক একটা অংশ প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, কিংবা অন্তত তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা বিপন্ন হয়। এরাও আবার প্রলেতারিয়েতকে জ্ঞানালোক ও প্রগতির তুন কিছু কিছু উপাদান যোগায়।

শেষ পর্যন্ত শ্রেণি-সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে, তখন শাসক শ্রেণির মধ্যে, বস্তুতপক্ষে পুরনো সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে ভাঙনের যে প্রক্রিয়া চলছে তা এমন একটা প্রখর হিংস্র রূপ নেয় যে, শাসক শ্রেণির একটা ছোটো অংশ নিজেকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে, হাত মেলায় বিপ্লবী শ্রেণির সঙ্গে, সেই শ্রেণির সঙ্গে যার হাতেই ভবিষ্যত। তাই, আগেকার এক যুগে যেমন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণির দিকে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই এখন বুর্জোয়াদের একটা ভাগ যোগ দেয় প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে, বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের কিছু কিছু, যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে নিজেদের তুলতে পেরেছে।

আজকের দিনে বুর্জোয়া শ্রেণির মুখোমুখি যে সব শ্রেণি দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েতই প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণি। অপর শ্রেণিগুলি আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সামনে ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়, প্রলেতারিয়েত হল সেই যন্ত্রশিল্পের বিশিষ্ট ও অপরিহার্য সৃষ্টি।

নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছোটো হস্তশিল্প কারখানার মালিক, দোকানদার, কারিগর, চাষি — এরা সকলে মধ্য শ্রেণির টুকরো হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে। তাই তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। বলতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীলও, কেননা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা। আপতিকভাবে যদি এরা বিপ্লবী হয়, তবে তা হয় কেবল তাদের প্রলেতারিয়েত রূপে আসন্ন রূপান্তরের কারণে, সুতরাং তারা তখন রক্ষা করে তাদের বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যত স্বার্থ, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে তারা প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গির শরণাপন্ন হয়।

পুরনো সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে ছিটকে-পড়া যেসব লোক নিষ্ক্রিয়ভাবে পচছে, সেই লিউম্পেন-প্রলেতারিয়েতকে প্রলেতারিয় বিপ্লব এখানে ওখানে আন্দোলনের মধ্যে ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু এদের জীবনযাত্রার ধরনটা এমনই যে, তা প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের ভাড়াটে হাতিয়ারের ভূমিকার জন্য তাদের অনেক বেশি তৈরি করে তোলে।

প্রলেতারিয়েতের জীবনাবস্থাতে পুরনো সমাজের সাধারণ অবস্থাগুলি কার্যত প্রায় লোপ পেতে বসেছে। প্রলেতারিয়েতের সম্পত্তি নেই, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে তার যা সম্পর্ক সেটার সঙ্গে বুর্জোয়ার পরিবারগত সম্পর্ক মেলে না, আধুনিক শিল্প-শ্রম, পুঁজির কাছে এখনকার বশ্যতা স্বীকার — ইংলন্ড বা ফ্রান্সে আমেরিকা অথবা জার্মানিতে সর্বত্র এই একই ব্যাপার ঘটছে, যাতে তার জাতীয় চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লোপ পেয়েছে। তার কাছে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম হল কয়েকটা বুর্জোয়া পক্ষপাতমূলক ধারণা, যার পিছনে ঘাপটি মেরে রয়েছে আসলে অনেকগুলি বুর্জোয়া স্বার্থ।

অতীতের যে সব শ্রেণি কর্তৃত্ব পেয়েছে, তারা সবাই অর্জিত প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করতে চেয়েছে গোটা সমাজের উপর তাদের দখলির শর্তটা চাপিয়ে দিয়ে। প্রলেতারিয়েত তাদের দখলির নিজস্ব পূর্বতন পদ্ধতি উচ্ছেদ না করে এবং তার দ্বারা দখলির প্রত্যেকটি ভূতপূর্ব পদ্ধতির অবসান না ঘটিয়ে, উৎপাদন-শক্তির কর্তা হতে পারে না। তাদের নিজস্ব বলতে এমন কিছু নেই যাকে আয়ত্তে এনে নিশ্চিত এবং দৃঢ়তর করতে হবে, ব্যক্তিগত মালিকানার সব রকমের পূর্বতন নিরাপত্তা ও নিশ্চিতি নির্মূল করে দেওয়াই তাদের ব্রত।

অতীতের ইতিহাসের প্রতিটি আন্দোলন ছিল সংখ্যালঘুর দ্বারা অথবা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে আন্দোলন। প্রলেতারিয় আন্দোলন হচ্ছে সংখ্যাগুরুর স্বার্থে বিপুল সংখ্যাধিক্যের আত্মসচেতন স্বতন্ত্র আন্দোলন। প্রলেতারিয়েত আজকের সমাজে নিম্নতম স্তর, তাকে নড়াতে হলে, তাকে উঠে দাঁড়াতে হলে, তার উপরে চাপানো সরকারি

সমাজের গোটা স্তরটিকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত না করে উপায় নেই।

বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াইটা মর্মবস্তুতে না হলেও আকারের দিক থেকে হল প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে হিসাব মেটাতে নিজেদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে।

প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সাধারণতম পর্যায়গুলির ছবি আঁকতে গিয়ে বর্তমান সমাজের ভিতর কমবেশি যে প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলেছে — সে যুদ্ধ একটা বি(দুতে এসে প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের সবলে উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের শাসনের ভিত্তি — তার সন্ধান আমরা পেয়েছি।

আমরা আগেই দেখেছি যে, আজ পর্যন্ত সব ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে অত্যাচারি ও অত্যাচারিত শ্রেণির বিরোধের ভিত্তিতে। কিন্তু কোনো শ্রেণিকে নিপীড়ত করতে হলে তার জন্য এমন কিছুটা অবস্থা নিশ্চিত করতে হয় যাতে সে তার দাসোচিত অস্তিত্বটুকু অন্তত চালিয়ে যেতে পারে। ভূমিদাসত্বের যুগে ভূমিদাস নিজেকে কমিউন-সভ্যের পর্যায়ে তুলেছিল, ঠিক যেমন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের পেষণতলেও পেটি বুর্জোয়া পেরেছিল বুর্জোয়া রূপে বিকশিত হতে। পক্ষান্তরে, আধুনিক মজুর কিন্তু যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উঁচুতে ওঠে না, স্বীয় শ্রেণির অস্তিত্বের যা শর্ত, তারও নিচে ক্রমশই বেশি করে তাকে নেমে যেতে হয়। মজুর হয়ে পড়ে নিঃস্ব প্রত্রঙ আর নিঃস্বতা বেড়ে চলে জনসংখ্যা ও সম্পদবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর গতিতে। এই সূত্রেই পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয় যে, বুর্জোয়া শ্রেণির আর সমাজের শাসক হয়ে থাকার যোগ্যতা নেই, নিজেদের অস্তিত্বের শর্তটাকে চরম আইন হিসেবে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার অধিকার নেই। বুর্জোয়া শ্রেণি শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ তারা দাসত্বের মধ্যে দাসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম, তাদের এমন অবস্থায় না নামিয়ে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে খাওয়ার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়। এই বুর্জোয়ার শাসনে সমাজ আর বাস করতে পারে না, অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলতে গেলে তার অস্তিত্ব আর সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না।

বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব ও শাসনের মূল শর্ত হল পুঁজির গঠন ও বৃদ্ধি, পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত হল মজুরি-শ্রম। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণি না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতাজনিত বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন থেকে বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি উৎপাদন করে ও উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নেয়। তাই বুর্জোয়া শ্রেণি সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তাদেরই — যারা তাকে কবর দেবে। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য।

২
প্রলেতারিয়রা ও কমিউনিস্টরা

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়দের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কি সম্বন্ধ ?

শ্রমিক শ্রেণির অন্যান্য পার্টিগুলির প্রতিপক্ষ হিসেবে কমিউনিস্টরা পৃথক পার্টি গঠন করে না।

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ তাদের নেই।

প্রলেতারিয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে পিটে তোলার জন্য তারা নিজস্ব কোনো গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।

শ্রমিক শ্রেণির অন্যান্য পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের তফাতটা শুধু এই : (১) নানা দেশের প্রলেতারিয়দের জাতীয় সংগ্রামের মধ্য থেকে তারা সমস্ত জাতি-নির্বিশেষে সমগ্র প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থটার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে। (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তার মধ্যে তারা সর্বদা ও সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

সুতরাং, কমিউনিস্টরা হল একদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতি দেশের শ্রমিক শ্রেণির পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ — যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়, অপরদিকে, তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রলেতারিয়েতের অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে, প্রলেতারিয় আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে।

কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য অন্য সমস্ত প্রলেতারিয় পার্টির উদ্দেশ্য থেকে অভিন্ন : প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণি রূপে গঠন করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার।

ঢালাওভাবে যে-কোনো অবস্থাতে কোনো হবু সংস্কারক যে ধারণা বা নীতিগুলি আবিষ্কার বা প্রকাশ করেন, তার উপর নির্ভর করে কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি স্থির করা হয় না।

যে শ্রেণি-সংগ্রাম, যে ঐতিহাসিক আন্দোলন আমাদের নিজেদের চোখের সামনে বর্তমান, তা থেকে বাস্তব যে সম্পর্কগুলির উৎপত্তি, কমিউনিস্ট তত্ত্ব কেবল তাকেই সাধারণ সূত্র রূপে প্রকাশ করে। প্রচলিত মালিকানা সম্পর্কের উচ্ছেদটা মোটেই কমিউনিজমের একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়।

ইতিহাসে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সমস্ত মালিকানা-সম্পর্কেরও ঐতিহাসিক বদল ঘটেছে।

যেমন, ফরাসি বিপ্লব বুর্জোয়া মালিকানার অনুকূলে সামন্ত মালিকানার উচ্ছেদ করেছিল।

সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক।

কিন্তু শ্রেণি-বিরোধের উপর, অল্পলোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করার ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও পূর্ণতম প্রকাশ হল আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা।

এই অর্থে কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে : ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।

আমাদের বিরুদ্ধে — কমিউনিস্টরেদ বিরুদ্ধে — অভিযোগ আনা হয়েছে যে, ব্যক্তিবিশেষের নিজ পরিশ্রমের ফল হিসেবে নিজস্ব সম্পত্তি অর্জনের অধিকারটিকে আমরা উচ্ছেদ করতে চাই, যে-কোনো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কর্মতৎপরতা ও স্বাবলম্বনের মূল ভিত্তিই নাকি এই সম্পত্তি।

কষ্টলব্ধ, স্বাধিকৃত, স্বোপার্জিত সম্পত্তি ! ছোটো কারিগর ও ক্ষুদে চাষির সম্পত্তির কথাই কি বলা হচ্ছে,

যে ধরনের সম্পত্তি ছিল বুর্জোয়া সম্পত্তির আগে! তাকে উচ্ছেদ করার কোনো প্রয়োজন নেই, যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ইতিমধ্যেই তাকে অনেকাংশে ধ্বংস করেছে, এখনও প্রতিদিন ধ্বংস করে চলেছে।

নাকি বলা হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানার কথা?

কিন্তু মজুরি-শ্রম কি মজুরদের জন্য কোনো সম্পত্তি সৃষ্টি করে? একেবারেই না। সে সৃষ্টি করে পুঁজি, অর্থাৎ সেই ধরনের সম্পত্তি যা মজুরি-শ্রমকে শোষণ করে, নিত্য নতুন শোষণের জন্য নতুন নতুন মজুরি-শ্রমের সরবরাহ সৃষ্টি না করে যা বাড়তে পারে না। বর্তমান ধরনের এই সম্পত্তি পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দ্বন্দ্বের দুটি দিকই পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পুঁজিপতি হতে হলে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে শুধু একটা ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। পুঁজি একটা যৌথ সৃষ্টি, সমাজের অনেক লোকের মিলিত কাজের ফলে, এমন কি শেষ অবধি, সমাজের সকল লোকের মিলিত কর্মেই পুঁজিকে চালু করা যায়।

পুঁজি তাই ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি।

কাজেই পুঁজিকে সাধারণ সম্পত্তিতে অর্থাৎ সমাজের সকল লোকের সম্পত্তিতে পরিণত করলে, তার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় না। মালিকানার সামাজিক রূপটাই কেবল বদলে যায়। তার শ্রেণিগত প্রকৃতিটা লোপ পায়।

এবার মজুরি-শ্রমের কথা ধরা যাক।

মজুরি-শ্রমের গড়পড়তা দাম হল নিম্নতম মজুরি, অর্থাৎ মেহনতকারী রূপে মেহনতির মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার জন্য যা একান্ত আবশ্যক, গ্রাসাচ্ছাদনের সেইটুকু উপকরণ। সুতরাং মজুরি-শ্রমিক শ্রম করে যেটুকু ভাগ পায় তাতে কেবল কোনোক্রমে এই অস্তিত্বটুকু চালিয়ে যাওয়া ও তার পুনরুৎপাদন করা চলে। শ্রমোৎপন্নের উপর এই ব্যক্তিগত দখলি, যা কেবল মানুষের প্রাণরক্ষা ও নতুন মানুষের জন্মদানের কাজে লাগে এবং অপরের পরিশ্রমের উপর কর্তৃত্ব চালাবার মতো কোনো উদ্বৃত্ত যার থাকে না, তেমন ব্যক্তিগত দখলির উচ্ছেদ একেবারেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু যা করতে চাই তা হল এই দখলির শোচনীয় চরিত্রের অবসান — যাতে শ্রমিক শুধু পুঁজিকে বৃদ্ধি করার জন্য বাঁচে, এবং তাকে বাঁচতে হয় শাসক শ্রেণির স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতটা প্রয়োজন ঠিক ততখানি পর্যন্ত।

বুর্জোয়া সমাজে জীবন্ত শ্রম কেবল সঞ্চিত শ্রমকে বাড়াবার উপায়মাত্র। কমিউনিস্ট সমাজে কিন্তু পূর্বসঞ্চিত শ্রম শ্রমিকের অস্তিত্বকে উদারতর, সমৃদ্ধতর, উন্নততর করে তোলার উপায়।

সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত, কমিউনিস্ট সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হল স্বাধীন এবং তার স্বতন্ত্র সত্তা আছে, কিন্তু জীবন্ত মানুষ হল পরাধীন এবং তার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

অথচ এমন অবস্থার অবসানকেই বুর্জোয়ারা বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উচ্ছেদ! কথাটা সত্যই। বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ব, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য, বুর্জোয়া স্বাধীনতা উচ্ছেদই যে লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই।

উৎপাদনের বর্তমান বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এই স্বাধীনতার অর্থ হল অবাধ বাণিজ্য, অবাধে বেচাকেনার অধিকার।

কিন্তু যদি বেচাকেনাই লোপ পায়, তবে অবাধ বেচাকেনাও থাকবে না। এই অবাধ বেচাকেনার কথাটা এবং সাধারণভাবে স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের বুর্জোয়াদের অন্য সব 'বড়ো বড়ো কথার' যদি কোনো অর্থ থাকে তবে সে শুধু সীমাবদ্ধ বেচাকেনার সঙ্গে তুলনীয়, মধ্যযুগীয় বাধাগ্রস্ত বণিকদের সঙ্গে তুলনায়, কিন্তু বেচাকেনার, উৎপাদনের বুর্জোয়া অবস্থা ও খোদ বুর্জোয়া শ্রেণিটারই যে উচ্ছেদের কথা কমিউনিস্টরা বলে, সেসবের কাছে এগুলির কোনো অর্থ টেকে না।

আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসমষ্টির দশজনের মধ্যে নয়জনের ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে, অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে সম্পত্তি থাকার একমাত্র কারণ হল ওই দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে কিছুই না থাকা!

সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ দাঁড়ায় এই যে, সম্পত্তির অধিকারের এমন একটা রূপ আমরা তুলে দিতে চাই যা বজায় রাখার অনিবার্য শর্ত হল সমাজের বিপল সংখ্যাধিক লোকের সম্পত্তি না থাকা।

এক কথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিযোগ তো এই যে আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক কথা, আমাদের অভিপ্রায় ঠিক তা-ই।

যে মুহূর্ত থেকে শ্রমকে আর পুঁজি, মুদ্রা অথবা ভূমি-খাজনাতে পরিণত করা চলে না, সংক্ষেপে, একচেটিয়া কর্তৃত্বের মুঠির আয়ত্তে একটা সামাজিক শক্তিতে পরিণত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, অর্থাৎ যে মুহূর্ত থেকে নিজস্ব মালিকানা আর বুর্জোয়া মালিকানায়, পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে পারে না, তখনই, আপনারা বলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়ে গেল।

তা হলে স্বীকার করুন যে, 'ব্যক্তি' বলতে বুর্জোয়া ছাড়া, শুধু মধ্য শ্রেণিভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছাড়া আপনারা অন্য লোককে ধরেন না। এহেন ব্যক্তিকে অবশ্যই ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে, তার অস্তিত্বই অসম্ভব করে তুলতে হবে।

সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগদখলের অধিকার থেকে কমিউনিজম কোনো লোককে বঞ্চিত করে না, দখল করার মাধ্যমে অপরের শ্রমকে করায়ত্ত করার ক্ষমতা থেকে তাকে বঞ্চিত করে মাত্র।

আপত্তি উঠেছে যে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সর্বব্যাপী আলস্য আমাদের অভিভূত করবে।

এই মত ঠিক হলে বহুপূর্বেই নিছক আলস্যের বশে বুর্জোয়া সমাজের রসাতলে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ এই সমাজে যারা খাটে তারা কিছু অর্জন করে না, আর যারা কিছু অর্জন করে তাদের খাটতে হয় না। সমস্ত আপত্তিটাই অন্য ভাষায় এই পুনরুক্তির শামিল, যখন পুঁজি থাকবে না তখন মজুরি-শ্রমও আর থাকতে পারে না।

বৈষয়িক দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগদখলের কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে যত আপত্তি আনা হয়, বুদ্ধিবৃত্তিগত সামগ্রীগুলির উৎপাদন ও ভোগদখলের কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধেও ঠিক সেই আপত্তি তোলা হয়। বুর্জোয়ার কাছে শ্রেণিগত মালিকানার উচ্ছেদটা যেমন উৎপাদনেরই অবসান বলে মনে হয়, তেমনি শ্রেণিগত শিক্ষালাভের বিলোপ তার কাছে সকল শিক্ষালাভের লোপ পাওয়ার সমার্থক।

যে শিক্ষার অবসানের ভয়ে বুর্জোয়ারা বিলাপ করে, বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের কাছে তা যন্ত্রের মতো কাজ করার একটা তালিম মাত্র।

আমাদের অভিপ্রেত বুর্জোয়া সম্পত্তির উচ্ছেদ সম্বন্ধে আপনারা যতক্ষণ স্বাধীনতা, শিক্ষালাভ, আইন ইত্যাদির বুর্জোয়া ধারণার আশ্রয় নেবেন, ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন না। আপনাদের ধারণাগুলিই যে আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া মালিকানার পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত, ঠিক যেমন আপনাদের শ্রেণির ইচ্ছাটা সকলের উপর আইন হিসেবে চাপিয়ে দেওয়াটাই হল আপনাদের আইনশাস্ত্র, আপনাদের এ ইচ্ছাটার মূল প্রকৃতি এবং লক্ষ্য আবার নির্ধারিত হচ্ছে আপনাদের শ্রেণিরই অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা।

আপনাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি ও মালিকানার রূপ থেকে যে সামাজিক রূপগুলি মাথা তোলে, ঐতিহাসিক এই যে সম্পর্ক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদয় ও লয় পায়, একটা স্বার্থপর ভুল ধারণার ফলে আপনারা তাকে প্রকৃতি ও বিচারবুদ্ধির চিরন্তন নিয়মে রূপান্তরিত করতে চান — আপনাদের আগে যত শাসক শ্রেণি এসেছিল তাদেরও সকলেরই ছিল অনুরূপ বিভ্রান্তি। প্রাচীন মালিকানার ক্ষেত্রে যে কথাটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার, সামন্ত মালিকানার বেলায় যা আপনারা মেনে নেন, আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া ধরনের মালিকানার ক্ষেত্রে অবশ্যই সে কথা আপনাদের স্বীকার করা বারণ।

পরিবারের উচ্ছেদ! উগ্র চরমপন্থীরা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের এই গর্হিত প্রস্তাবে ক্ষেপে ওঠে।

আধুনিক পরিবার অর্থাৎ বুর্জোয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠা কোন ভিত্তিতে হয়েছে? সে ভিত্তি হল পুঁজি, ব্যক্তিগত

লাভ। এই পরিবারের পূর্ণ বিকশিত রূপটি শুধু বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই অবস্থারই অনুপূরণ দেখা যাবে প্রলেতারিয়দের মধ্যে পরিবারের কার্যত অনুপস্থিতি এবং প্রকাশ্য পতিতাবৃত্তির ভিতর।

অনুপূরক এই অবস্থার অবলোপের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া পরিবারের লোপও অবশ্যম্ভাবী, পুঁজির উচ্ছেদের সঙ্গেই ঘটবে উভয়ের অন্তর্ধান।

আমাদের বিরুদ্ধে কি আপনারা এই অভিযোগ করেন যে সন্তানের উপর পিতামাতার শোষণ আমরা শেষ করে দিতে চাই ? এ অপরাধ আমরা স্বীকার করছি।

কিন্তু আপনারা বলবেন যে, আমরা সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক ধ্বংস করে দিই যখন আমরা পারিবারিক শিক্ষার স্থানে বসাই সামাজিক শিক্ষাকে।

আর আপনাদের শিক্ষাটা ! সেটাও কি সামাজিক নয় এবং সামাজিক যে অবস্থার আওতায় শিক্ষাদান চলে তা দিয়ে, স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের সাক্ষাৎ কিংবা অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ মারফত কি সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় না ? শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ করাটা কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়, তারা চায় শুধু সেই হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, শাসক শ্রেণির প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।

আধুনিক যন্ত্রশিল্পের ক্রিয়ায় মজুরদের মধ্যে সকল পারিবারিক বন্ধন যত বেশি মাত্রায় ছিন্ন হতে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা যত বেশি করে সামান্য কেনাবেচার বস্তু ও পরিশ্রমের হাতিয়ারে পরিণত হতে থাকে, পরিবার ও শিক্ষা বিষয়ে, বাপ-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পবিত্র সম্বন্ধ নিয়ে বুর্জোয়াদের বাগাড়ম্বর ততই বিতৃষ্ণাজনক হয়ে ওঠে।

সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণি সমস্বরে চীৎকার করে বলে — কিন্তু তোমরা কমিউনিস্টরা যে নারীদের সাধারণ সম্পত্তি করে ফেলতে চাও।

বুর্জোয়া নিজের স্ত্রীকে নিতান্ত উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবেই দেখে থাকে। তাই যখন সে শোনে যে, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি সমবেতভাবে ব্যবহার করার কথা উঠেছে, এবং স্বভাবতই নারীদের ভাগ্যেও তাহলে সকলের ভোগ্য হতেই হবে — এছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্তে সে আসতে পারে না।

ঘুণাক্ষরেও তার মনে সন্দেহ জাগে না যে, আসল লক্ষ্য হল উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র হয়ে থাকার দশা থেকে নারীদের মুক্তিসাধন।

তা ছাড়া, মেয়েদের উপর এই সাধারণ অধিকারটা কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে এই ভান করে আমাদের বুর্জোয়ারা যে এত ধার্মিক ক্রোধ দেখায় তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু নেই। নারীদের সাধারণ সম্পত্তি করার প্রয়োজন কমিউনিস্টদের নেই, প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে সে প্রথার প্রচলন আছে।

সামান্য বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, মজুরদের স্ত্রী-কন্যাকে হাতে পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রীদের চরিত্রভ্রষ্ট করাতেই তাদের পরম আনন্দ।

বুর্জোয়া বিবাহ হল আসলে সকলে মিলে এজমালিভাবে স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা। অতএব কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বড়ো জোর এই কলঙ্ক রটানো যেতে পারে যে, ভণ্ডামির আড়ালে মেয়েদের উপর সাধারণ যে অধিকার লুকানো রয়েছে সেটাকে এরা প্রকাশ্য আইনসম্মত রূপ দিতে চায়। এটুকু ছাড়া এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির অবলোপের সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত নারীদের উপর সাধারণ অধিকারেরও অবসান আসবে, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন দুই ধরনের বেশ্যাবৃত্তিই শেষ হয়ে যাবে।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, তারা স্বদেশ ও স্বজাতিত্ব তুলে দিতে চায়।

মেহনতি মানুষদের কোনো দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, দেশের পরিচালক শ্রেণির পদে উন্নীত হতে হবে, নিজেকেই জাতি হয়ে উঠতে হবে, তাই সেদিক থেকে বলতে গেলে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতীয়, যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়।

বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার অনুগামী ধরনে

একটা সর্বজনীন ভাব — এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিবিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য সেগুলির আরও দ্রুত অবসানের কারণ হবে। প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।

যে পরিমাণে এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ করা যাবে, সেই অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণটাও বন্ধ হয়ে আসবে।

যে পরিমাণে জাতির মধ্যে শ্রেণি-বিরোধ অন্তর্হিত হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও শেষ হয়ে যাবে।

ধর্ম, দর্শন এবং সাধারণভাবে মতাদর্শের দিক থেকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হওয়ারও যোগ্য নয়।

মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, তার সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজজীবনের প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাভাবনা, মতামত ও ধ্যানধারণা, এক কথায় মানুষের চেতনা যে বদলে যায়, এ কথা বুঝতে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাগে?

বৈষয়িক উৎপাদন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে বুদ্ধিবৃত্তিগত সৃষ্টির প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে — এ ছাড়া চিন্তার ইতিহাস আর কী প্রমাণ করে? প্রতি যুগেই যে সব ধারণা আধিপত্য করেছে সেগুলি চিরকালই তখনকার শাসক শ্রেণিরই ধারণা।

লোকে যখন এমন ধারণার কথা বলে যা সমাজে বিপ্লব আনছে, তখন শুধু এই সত্যই প্রকাশ করা হয় যে, পুরনো সমাজের মধ্যে নতুন এক সমাজের উপাদান সৃষ্টি হয়েছে, এবং অস্তিত্বের পুরনো অবস্থার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ধারণার বিলোপ তাল রেখে চলছে।

প্রাচীন জগতের যখন অন্তিম অবস্থা, তখনই খ্রিস্টান ধর্ম পুরনো ধর্মগুলিকে পরাস্ত করেছিল। খ্রিস্টান ধারণাগুলি যখন আঠারো শতকে যুক্তিবাদী ধারণার কাছে হার মানে তখন সামন্ত সমাজেরও মৃত্যুসংগ্রাম চলেছিল সেদিনের বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে। ধর্মমতের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতার ধারণা শুধু জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার আধিপত্যটাকেই রূপ দিয়েছিল।

বলা হবে যে, 'ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং আইনী ধারণাগুলিতে পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সে পরিবর্তন সত্ত্বেও নিয়ত টিকে থেকেছে ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, রাজনীতি ও আইন।'

'তা ছাড়া স্বাধীনতা, ন্যায় ইত্যাদি চিরন্তন সত্য আছে, সমাজের সকল অবস্থাতেই তারা বিদ্যমান। কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্যকেই উড়িয়ে দেয়, ধর্ম ও নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করে তা সব ধর্ম ও সব নৈতিকতারই উচ্ছেদ করে, তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।'

এই অভিযোগ কোথায় এসে দাঁড়ায়? সকল অতীত সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণি-বিরোধের বিকাশ, বিভিন্ন যুগে সে বিরোধ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কিন্তু যে রূপই নিক একটা ব্যাপার অতীতের সকল যুগেই বর্তমান যথা, সমাজের এক অংশ কর্তৃক অপর অংশকে শোষণ। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, অতীত যুগের সামাজিক চেতনায় যত বিভিন্নতা ও বিচিত্রতাই প্রকাশ পাক না কেন, তা কয়েকটি নির্দিষ্ট সাধারণ রূপ বা সাধারণ ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, শ্রেণি-বিরোধের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির আগে তা পুরোপুরি অদৃশ্য হতে পারে না।

কমিউনিস্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ, এই বিপ্লবের বিকাশে যে চিরাচরিত ধারণার সঙ্গেও একেবারে আমূল একটা বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কী।

কিন্তু কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া আপত্তির প্রসঙ্গ যাক।

আগে আমরা দেখেছি যে, শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণির পদে

উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়ী হওয়া।

বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণি রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদন-শক্তির মোট সমষ্টিটাকে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে বাড়িয়ে তোলার জন্য, প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।

শুরুতে অবশ্যই মালিকানার অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদন পরিস্থিতির উপর স্বৈরাচারী আক্রমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, সুতরাং তা করতে হবে এমন সব ব্যবস্থা মারফত যা অর্থনীতির দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও অযৌক্তিক মনে হবে, কিন্তু তাদের যাত্রাপথে এরা নিজ সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং পুরনো সমাজব্যবস্থার উপর আরও আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে, উৎপাদন-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপ্লবীকরণের উপায় হিসেবে যেটা অপরিহার্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুলি হবে বিভিন্ন।

তা সত্ত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি মোটের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য :

১। জমি মালিকানার অবসান, জমির সমস্ত খাজনা সার্বজনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ।

২। উচ্চমাত্রার ক্রমবর্ধমান বা ক্রমবিভক্ত হারে আয়কর।

৩। সবরকমের উত্তরাধিকার বিলোপ।

৪। সমস্ত দেশত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

৫। রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া সহ একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফত সমস্ত ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৬। যোগাযোগ ও পরিবহণের সমস্ত উপায় রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৭। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা ও উৎপাদন-উপকরণের প্রসার, পতিত জমির আবাদ এবং এক সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র জমির উন্নতিসাধন।

৮। সকলের পক্ষে সমান শ্রমবাধ্যতা। শিল্পবাহিনি গঠন, বিশেষত কৃষিকার্যের জন্য।

৯। কৃষিকার্যের সঙ্গে পণ্যনির্মাণ শিল্পের সংযুক্তি, সারা দেশে জনসংখ্যার আরো বেশি সমভাবে বণ্টন মারফত ক্রমে ক্রমে শহর ও গ্রামের প্রভেদ লোপ।

১০। সরকারি বিদ্যালয়ে সকল শিশুর বিনা খরচে শিক্ষা। ফ্যাক্টরিতে বর্তমান ধরনের শিশুশ্রমের অবসান। শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তি ইত্যাদি।

বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণি-পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারি (public) শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। যথার্থভাবে অভিহিত রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণির উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণির সংগঠিত শক্তি মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে লড়াইয়ের অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজকে শ্রেণি হিসেবে সংগঠিত করতে বাধ হয়, বিপ্লবের মাধ্যমে তারা যদি নিজেদের শাসক শ্রেণিতে পরিণত করে এবং শাসক শ্রেণি হয়ে উৎপাদনের পুরনো অবস্থাকে তারা যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তা হলে সেই পুরনো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণি-বিরোধ তথা সবরকম শ্রেণির অস্তিত্বটাই দূর করে বসবে এবং তাতে করে শ্রেণি হিসেবে তাদের স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান ঘটাবে।

শ্রেণি ও শ্রেণি-বিরোধ সংবলিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।

৩
সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সাহিত্য
১। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র
ক) সামন্ত সমাজতন্ত্র

স্বীয় ঐতিহাসিক অবস্থানের কারণে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের অভিজাতদের কাছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লেখা একটা কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের ফরাসি বিপ্লবে এবং ইংলন্ডের সংস্কার (২৯) আন্দোলনে ঘৃণ্য ভুঁইফোড়দের হাতে এদের আবার পরাভব হল। এর পর এদের পক্ষে একটা গুরুতর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালানোর কথাই ওঠে না। সম্ভব রইল একমাত্র মসীযুদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রেস্টোরেশন (restoration)* যুগের পুরনো ধ্বনিগুলি তখন অচল হয়ে পড়েছে। লোকের সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য অভিজাতরা বাধ্য হল বাহ্যত নিজেদের স্বার্থ ভুলে কেবল শোষিত শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থেই বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ খাড়া করতে। এইভাবে অভিজাতরা প্রতিশোধ নিতে লাগল তাদের নতুন প্রবুদের নামে টিটকারি দিয়ে, তাদের কানে কানে আসন্ন প্রলয়ের ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে।

এইভাবে উদয় হল সামন্ত সমাজতন্ত্রের : তার অর্ধেক বিলাপ আর অর্ধেক টিটকারি, অর্ধেক অতীতের প্রতিধ্বনি এবং অর্ধেক ভবিষ্যতের হুমকি, মাঝে মাঝে এদের তিক্ত, ব্যঙ্গাত্মক ও সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা বুর্জোয়াদের মর্মে গিয়ে বিঁধত, অথচ আধুনিক ইতিহাসের অগ্রগতি উপলব্ধি করতে একান্ত অক্ষমতায় মোট ফলটা হত হাস্যকর।

জনগণকে নিজের দিকে টেনে আনার জন্য অভিজাতবর্গ নিশানের মতো সামনে তুলে ধরত প্রলেতারিয় ভিক্ষার থলিটাকে। জনগণ কিন্তু যতবারই দলে ভিড়েছে ততবারই এদের পিছন দিকটায় সামন্ত দরবারি চাপরাশ দেখে অশ্রদ্ধার অট্টহাসি হেসে এদের ছেড়ে চলে গেছে।

এ প্রহসনটা দেখায় ফরাসি লেজিটিমিস্টদের একাংশ এবং 'নবীন ইংলন্ড' (৩০) গোষ্ঠী।

বুর্জোয়া শোষণ থেকে তাদের শোষণ-পদ্ধতি অন্য ধরনের ছিল এটা দেখাতে গিয়ে সামন্তপন্থীরা মনে রাখে না যে, সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতি ও অবস্থায় তাদের শোষণ চলত, যা আজকের দিনে অচল হয়ে পড়েছে। তাদের আমলে আজকালকার প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বই ছিল না — দেখাতে গিয়ে তারা ভুলে যায় যে, তাদের নিজস্ব সমাজেরই অনিবার্য সন্তান হল আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণি।

তা ছাড়া নিজেদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা এরা এত কম ঢাকে যে, বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে এদের প্রধান অভিযোগ দাঁড়ায় — বুর্জোয়া রাজত্বে এমন এক শ্রেণি গড়ে উঠছে, সমাজের পুরনো ব্যবস্থাকে আগাগোড়া নির্মূল করাই যার নির্বন্ধ।

বুর্জোয়া শ্রেণি প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করছে তার জন্য তত নয়, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করছে — এটাই হল এদের অভিযোগ।

সুতরাং রাজনীতির কার্যক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে দমনের সকল ব্যবস্থায় এরা যোগ দেয়, আর সাধারণ জীবনযাত্রায় বড়ো বড়ো বুলি সত্ত্বেও শিল্পের গাছ থেকে পড়া সোনার ফল কুড়িয়ে নিতে এদের আপত্তি নেই, পশম, বীটচিনি অথবা আলুঘটিত সুরার** ব্যবসার জন্য সত্য, প্রেম, মর্যাদা বেচতে এদের দ্বিধা হয় না।

* ১৬৬০ থেকে ১৬৮৯ সালের ইংরেজি রেস্টোরেশন নয়, ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সালের ফরাসি রেস্টোরেশন। (১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

**কথাটা বিশেষ করে জার্মানি সম্বন্ধে খাটে। সেখানে অভিজাত ভূস্বামী ও জমিদাররা বড়ো বড়ো মহালে নিজেরাই গোমস্তা রেখে চাষ করায়, তা ছাড়া নিজেরাই ব্যাপকভাবে বীটচিনি ও আলুঘটিত সুরা তৈরি করে। এদের চেয়ে অবস্থাপন্ন ইংরেজ অভিজাতরা এখনও ঠিক এতটা নামে নি, কিন্তু তারাও কমতি খাজনার ক্ষতিপূরণের জন্য কমবেশি স(দেহজনক জয়ে(টস্টক কোম্পানি পত্তন করার কাজে নিজেদের নাম ধার দিতে জানে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

জমিদারের সঙ্গে পুরোহিত যেমন সর্বদাই হাত মিলিয়ে চলেছে, তেমনি সামন্ত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জুটেছে পাদরিদের সমাজতন্ত্র।

খ্রিস্টানী কৃচ্ছ্রসাধনকে সমাজতান্ত্রিক রং দেওয়ার চেয়ে সহজ কিছু নেই। খ্রিস্টান ধর্ম ব্যক্তিগত মালিকানা, বিবাহ ও রাষ্ট্রকে ধিক্কার দেয় নি কি? তার বদলে দয়া ও দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয়দমন, মঠব্যবস্থা ও গির্জার প্রচার করে নি কি তারা? যে পুণ্যোদককে পুরোহিতরা অভিজাতদের হৃদয়জ্বালাকে পবিত্র করে থাকে তারই নাম খ্রিস্টান সমাজতন্ত্র।

খ) পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়াদের হাতে একমাত্র সামন্ত অভিজাত শ্রেণিরই সর্বনাশ হয় নি, তারাই একমাত্র শ্রেণি নয় আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের আবহাওয়ায় যাদের বেঁচে থাকার মতো অবস্থা শুকিয়ে গিয়ে মরতে বসেছে। আধুনিক বুর্জোয়াদের অগ্রদূত ছিল মধ্যযুগের নাগরিক দল এবং ছোটো ছোটো খেতখামারের মালিক চাষিরা। শিল্প ও বাণিজ্যে যে সব দেশের বিকাশ অতি সামান্য, সেখানে উঠতি বুর্জোয়াদের পাশাপাশি এখনও এই দুই শ্রেণি দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে।

আধুনিক সভ্যতা যে সব দেশে সম্পূর্ণ বিকশিত, যেখানে আবার পেটি বুর্জোয়ার নতুন এক শ্রেণি উদ্ভব হয়েছে, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মাঝখানে এরা দোদুল্যমান, বুর্জোয়া সমাজের আনুষঙ্গিক একটা অংশ হিসেবে বারবার নতুন করে গড়ে উঠছে এরা। এই শ্রেণির অন্তর্গত বিভিন্ন লোক কিন্তু প্রতিযোগিতার চাপে ক্রমাগতই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, বর্তমান শিল্পের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এরা এমন কি এও দেখে যে, সময় এগিয়ে আসছে যখন আধুনিক সমাজের স্বাধীন স্তর হিসেবে এদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাবে, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে এদের স্থান দখল করবে তদারককারী কর্মচারি, গোমস্তা, অথবা দোকান কর্মচারি।

ফ্রান্সের মতো যেসব দেশে, চাষিরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি, সেখানে যে লেখকেরা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মজুরের দলে যোগ দিয়েছে, তারা যে বুর্জোয়া রাজত্বের সমালোচনায় কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়া মানদণ্ডের আশ্রয় নেবে এবং এই মধ্যবর্তী শ্রেণিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে, তা স্বাভাবিক। পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের উদয় হয় এইভাবে। এই ধারার নেতা হলেন সিস্‌মঁদি (৩১), শুধু ফ্রান্সে নয়, ইংলন্ডেও।

আধুনিক উৎপাদনের অবস্থার মধ্যে স্ববিরোধগুলিকে সমাজতন্ত্রের এই ধারাটি অতি তীক্ষ্ণভাবে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছে। সেটি অর্থনীতিবিদদের ভণ্ড কৈফিয়তের স্বরূপ ফাঁস করেছে, অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করেছে যন্ত্র ও শ্রমবিভাগের মারাত্মক ফলাফল, অল্প কয়েকজনের হাতে পুঁজি ও জমির কেন্দ্রীভবন, অতি-উৎপাদন ও সংকট, দেখিয়ে দিয়েছে পেটি-বুর্জোয়া ও চাষির অনিবার্য সর্বনাশ, প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা ও উৎপাদনের অরাজকতা, ধন বণ্টনের তীব্র অসমতা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের ধ্বংসাত্মক শিল্পগত লড়াই, সাবেকি নৈতিক বন্ধন, পুরনো পারিবারিক সম্বন্ধ এবং পুরনো জাতিসত্তাগুলির ভাঙন।

ইতিবাচক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সমাজতন্ত্রের এই রূপটি হয় উৎপাদন ও বিনিময়ের পুরনো উপায় ও সেই সঙ্গে সাবেকি মালিকানা-সম্পর্ক ও পুরনো সমাজ ফিরিয়ে আনতে, নয় উৎপাদন ও বিনিময়ের বর্তমান উপায়কে মালিকানা-সম্পর্কের সেই পুরনো কাঠামোর মধ্যেই আড়ষ্ট করে আটকে রাখতে সচেষ্ট, যা এই সব নতুন উপায়ের চাপে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, যা হওয়া অনিবার্য। উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রতিক্রিয়াশীল ও ইউটোপিয়।

এর শেষ কথা হল : শিল্পোৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধ গিল্‌ড্ প্রতিষ্ঠান, কৃষিকার্যে গোষ্ঠীপতিপ্রধান সম্পর্ক।

শেষ পর্যন্ত যখন ইতিহাসের কঠোর সত্যে নিজেদের ধোঁকা দেওয়ার সমস্ত নেশা কেটে যায়, তখন সমাজতন্ত্রের এ রূপটার অবসান হয় একটা শোচনীয় নাকিকান্নায়।

গ) জার্মান অথবা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র

ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল ক্ষমতাধর বুর্জোয়া শ্রেণির চাপে এবং এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিব্যক্তি রূপে। জার্মানিতে সে সাহিত্যের আমদানি হল যখন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানকার বুর্জোয়ারা সবেমাত্র লড়াই শুরু করেছে।

জার্মান দার্শনিকেরা, হবু দার্শনিকেরা, শৌখিন ভাবুকেরা (beaux esprits) সাগ্রহে এ সাহিত্য নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করল। তারা শুধু এইটুকু ভুলে গেল যে, ফ্রান্স থেকে এ ধরনের লেখা জার্মানিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি সামাজিক পরিস্থিতিও কিন্তু চলে আসে নি। জার্মানির সামাজিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে এই ফরাসি সাহিত্যের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক তাৎপর্য হারিয়ে গেল, তার চেহারা হল নিছক সাহিত্যিক। তাই আঠারো শতকের জার্মান দার্শনিকদের কাছে প্রথম ফরাসি বিপ্লবের দাবিগুলি মনে হল সাধারণভাবে 'ব্যবহারিক প্রজ্ঞার' (Practical Reason) দাবি মাত্র, এবং বিপ্লবী ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণির অভিপ্রায় ঘোষণার তাৎপর্য দাঁড়াল বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি, অনিবার্য, ইচ্ছাশক্তি, সাধারণভাবে যথার্থ মানবিক ইচ্ছাশক্তির আইন।

জার্মান লেখকদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল নতুন ফরাসি ধারণাগুলিকে নিজেদের সনাতন দার্শনিক চেতনার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অথবা যেন নিজেদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ না করে ফরাসি ধারণাগুলিকে আত্মসাৎ করা।

যেভাবে বিদেশি ভাষাকে আয়ত্ত করা হয় সেইভাবে, অর্থাৎ অনুবাদের সাহায্যে এই আত্মসাতের কাজ চলেছিল।

প্রাচীন অখ্রিস্টান জগতের চিরায়ত সাহিত্যের পুথিগুলির উপরেই সন্ন্যাসিরা কি ভাবে ক্যাথলিক সাধুদের নির্বোধ জীবনী লিখে রাখত সে কথা সুবিদিত। অপবিত্র ফরাসি সাহিত্যের ব্যাপারে জার্মান লেখকেরা এ পদ্ধতিটিকে উল্টে দেয়। মূল ফরাসির তলে তারা লিখল তাদের দার্শনিক ছাইপাঁশ। উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রার অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ফরাসি সমালোচনার তলে তারা লিখল 'মানবতার বিচ্ছেদ', বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ফরাসি সমালোচনার নিচে লিখে রাখল 'নির্বিশেষ এই প্রত্যয়ের সিংহাসনচ্যুতি' ইত্যাদি।

ফরাসি ঐতিহাসিক সমালোচনার পিছনে এইসব দার্শনিক বুলি জুড়ে দিয়ে তার নাম তারা দেয় 'কর্মের দশন', 'খাঁটি সমাজতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্রের জার্মান বিজ্ঞান', 'সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি' ইত্যাদি।

ফরাসি সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট রচনাগুলিকে এইভাবে পুরোপুরি নির্বীর্য করে তোলা হয়। জার্মানদের হাতে যখন এ সাহিত্য এক শ্রেণির বিরুদ্ধে অপর শ্রেণির সংগ্রামের অভিব্যক্তি হয়ে আর রইল না, তখন তাদের ধারণা হল যে, 'ফরাসি একদেশদর্শিতা' অতিক্রম করা গেছে, সত্যকার প্রয়োজন নয়, প্রকাশ করা গেছে সত্যের প্রয়োজনকে, প্রতিনিধিত্ব করা গেছে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের নয়, মানব-প্রকৃতির, নির্বিশেষ যে মানুষের শ্রেণি নেই, বাস্তবতা নেই, যার অস্তিত্ব কেবল দার্শনিক জল্পনার কুয়াশাবৃত রাজ্যে — তার স্বার্থের।

এই জার্মান সমাজতন্ত্র যে তাঁর স্কুল-পড়ুয়াসুলভ অনুশীলনকে অমন গুরুগম্ভীর ভারিক্কী চালে গ্রহণ করে সামান্য পশরাটা নিয়েই হাতুড়ে চিকিৎসকের কায়দায় গলাবাজি শুরু করেছিল, তার পুথিগত পণ্ডিতি সারল্যটাও কিন্তু ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘুচে গেছে।

সামন্ত অভিজাততন্ত্র ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিপক্ষে জার্মান, বিশেষ করে প্রাশিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণির লড়াইটা, অর্থাৎ উদারনৈতিক আন্দোলন তখন গুরুতর হয়ে ওঠে।

এর দ্বারা, রাজনৈতিক আন্দোলনের সামনে সমাজতন্ত্রের দাবিগুলি তুলে ধরবার বহুবাঞ্ছিত সুযোগ 'খাঁটি' সমাজতন্ত্রের কাছে এসে হাজির হয়, হাজির হয় উদারনীতির, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা, সংবাদপত্রের বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া বিধান, বুর্জোয়া মুক্তি ও সাম্যের বিরুদ্ধে চিরাচরিত অভিশাপ হানবার সুযোগ, জনগণের কাছে এই কথা প্রচারের সুযোগ হয় যে, এই বুর্জোয়া আন্দোলন থেকে তাদের লাভের কিছু নেই, সবকিছু হারাবারই সম্ভাবনা। ঠিক সময়টিতেই জার্মান সমাজতন্ত্র ভুলে গেল, যে-ফরাসি সমালোচনার সে মূঢ় প্রতিধ্বনি মাত্র সেখানে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্ব আগেই প্রতিষ্ঠিত, আর তার সঙ্গে ছিল অস্তিত্বের

আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও তদুপযোগী রাজনৈতিক সংবিধান, অথচ জার্মানিতে আসন্ন সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল ঠিক এইগুলিই।

পুরোহিত, প্রফেসার, য়ুঙ্কার (৩২), আমলা ইত্যাদি অনুচর সহ জার্মান স্বৈর সরকারগুলির কাছে আক্রমণোদ্যত বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে চমৎকার কাক-তাড়ুয়ার মতো তা কাজে লাগল।

ঠিক একই সময়ে যখন এই সরকারগুলি জার্মান শ্রমিক শ্রেণির বিদ্রোহগুলিকে চাবুক ও গুলির তিক্ত ওষুধ গেলাচ্ছিল, তার মধুর সমাপ্তি হল এতে।

এই 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র এদিকে এইভাবে সরকারগুলির কাজে লাগছিল জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার হিসেবে, আর সেই সঙ্গেই তা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ, জার্মানির কূপমণ্ডূকদের স্বার্থের প্রতিনিধি। জার্মানিতে প্রচলিত অবস্থার প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি হল পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি, ষোলো শতকের এই ভগ্নাবশেষ তখন থেকে নানা মূর্তিতে বারবার আবির্ভূত হয়েছে।

এই শ্রেণিকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হল জার্মানির বর্তমান অবস্থাটাকেই জীইয়ে রাখা। বুর্জোয়া শ্রেণির শিল্পগত ও রাজনৈতিক আধিপত্যে এ শ্রেণির নির্ঘাত ধ্বংসের আশঙ্কা — একদিকে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, অপরদিকে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অভ্যুদয়ে। মনে হল যেন এই দুই পাখিকে এক ঢিলেই মারতে পারবে 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র। মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ল তা।

জল্পনাকল্পনার মাকড়সার জালের পোশাক, তার উপর বাক্যালঙ্কারের নকশি ফুল, অসুস্থ ভাবালুতার রসে সিক্ত এই যে স্বর্গীয় আচ্ছাদনে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা তাদের অস্থিচর্মসার শোচনীয় 'চিরন্তন সত্য' দুটোকে সাজিয়ে দিল, তাতে এই ধরনের লোকসমাজে তাদের মালের অসম্ভব কাটতি বাড়ে।

জার্মান সমাজতন্ত্র নিজের দিক থেকে ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি করতে থাকে যে, কূপমণ্ডুক পেটি বুর্জোয়ার বাগাড়ম্বরী প্রতিনিধিত্বটাই তার কাজ।

তা ঘোষণা করল যে, জার্মান জাতি হল আদর্শ জাতি, কূপমণ্ডুক জার্মান মধ্যবিত্তই হল আদর্শ মানুষ। এই আদর্শ মানুষের প্রতিটি শয়তানি নীচতার এরা এক গূঢ় মহত্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিল, যা তার আসল প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। এমন কি কমিউনিজমের 'পাশবিক ধ্বংসাত্মক' ঝোঁকের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা ও সব ধরনের শ্রেণি-সংগ্রাম সম্বন্ধে পরম ও নিরপেক্ষ অবজ্ঞা ঘোষণায় তাদের দ্বিধা হল না। আজকের দিনে (১৮৪৭) যত তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট রচনা জার্মানিতে প্রচলিত, যৎসামান্য কয়েকটিকে বাদ দিলে তার সমস্তটাই এই কলুষিত ও নিস্তেজকর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।*

২। রক্ষণশীল অথবা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটা ক্রমাগত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণির একাংশ সামাজিক অভাব-অন্যায়ের প্রতিকার চায়।

এই অংশের মধ্যে পড়ে অর্থনীতিবিদেরা, লোকহিতব্রতীরা, মানবতাবাদীরা, শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার উন্নয়নকারীরা, দুঃস্থ-ত্রাণ সংগঠকেরা, পশুক্লেশ নিবারণী সভার সদস্যরা, মাদকতা নিবারণের গোঁড়া প্রচারকেরা, সম্ভবপর সবরকম ধরনের খুচরো সংস্কারকরা। সমাজতন্ত্রের এই রূপটি পরিপূর্ণ মতধারা হিসেবেও সংরচিত হয়ে উঠেছে।

এই রূপটার নিদর্শন হিসেবে আমরা প্রুধোঁ-র 'দারিদ্র্যের দর্শন'-এর উল্লেখ করতে পারি।

* ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী ঝড় এই সমগ্র নোংরা ঝোঁকটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে, সমাজতন্ত্র নিয়ে আরও কিছু জল্পনার বাসনাটুকুও ঘুচিয়ে দিয়েছে এর প্রবক্তাদের। এই ঝোঁকের প্রধান প্রতিভূ ও আদর্শ প্রতিচ্ছবি হলেন কার্ল গ্র্যুন মশাই (৩৩)। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

সমাজতন্ত্রী বুর্জোয়ারা আধুনিক সামাজিক অবস্তার সুবিধাটা পুরোপুরি চায়, চায় না তৎপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম ও বিপদটুকু। তারা সমাজের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে চায়, কিন্তু তার বৈপ্লবিক ও ধ্বংসকারী উপাদানসমূহ বাদ দিয়ে। তারা চায় প্রলেতারিয়েতবিহীন বুর্জোয়া শ্রেণি। যে-দুনিয়ায় তার সর্বেসর্বা, স্বভাবতই সেই দুনিয়াই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র এই সুবিধাজনক ধারণাকে নানা রকমের অল্পবিস্তর পরিপূর্ণ মততন্ত্রে বিকশিত করে। এরূপ মততন্ত্রকে কাজে পণিত করে প্রলেতারিয়েত সোজাসুজি সামাজিক নব জেরুজালেমে যাক, এই বলে এরা আসলে এটাই চায় যে, প্রলেতারিয়েত বর্তমান সমাজের চৌহদ্দির ভিতরেই থাকুক, কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণি সম্বন্ধে তার সমস্ত বিদ্বেষভাব বিসর্জন দিক।

এই সমাজতন্ত্রের আর-একটা অধিকতর ব্যবহারিক অথচ কম সুসংবদ্ধ রূপ আছে, তাতে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণির চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এই বলে যে, নিছক রাজনৈতিক কোনো সংস্কারে নয়, অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার, অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনেই তাদের সুবিধা হতে পারে। অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার পরিবর্তন বলতে অবশ্য এই ধরনের সমাজতন্ত্র কোনোক্রমেই বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কের উচ্ছেদ বোঝে না, যে উচ্ছেদ কেবল বিপ্লব দিয়েই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, বোঝে বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে শুধু প্রশাসনিক সংস্কার। অর্থাৎ এহেন সংস্কার যা পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্কটাকে কোনো দিক থেকেই আঘাত করে না, শুধু বড়জোর বুর্জোয়া সরকারের প্রশাসনের খরচ কমায় ও তাকে সরল করে আনে।

বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সর্বোত্তম প্রকাশ শুধু তখন, যখন তা একটা বাক্যালঙ্কার মাত্র।

অবাধ বাণিজ্য, শ্রমিক শ্রেণিরই উপকারের জন্য। সংরক্ষণ শুল্ক : শ্রমিক শ্রেণিরই উপকারের জন্য। কারাগারের সংস্কার : শ্রমিক শ্রেণিরই উপকারের জন্য। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের এই হল শেষ ও একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কথা।

সংক্ষেপে তা এই : বুর্জোয়ারা বুর্জোয়াই — তবে শ্রমিক শ্রেণির উপকারের জন্য।

৩। সমালোচনামূলক ইউটোপিয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

আধুনিক যুগের প্রতিটি বড়ো বড়ো বিপ্লবে যে সাহিত্য প্রলেতারিয়েতের দাবিকে ভাষা দিয়েছে, যেমন বাব্যেফ (৩৪) ও অন্যান্যদের রচনা, আমরা এখানে তার উল্লেখ করছি না।

সামন্ত সমাজের যখন উচ্ছেদ হচ্ছে তখনকার সর্বজনীন উত্তেজনার কালে নিজেদের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রলেতারিয়েতের প্রথম সরাসরি প্রচেষ্টাগুলি অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হয়, কারণ প্রলেতারিয়েত তখন অপরিণত অবস্থায়, তার মুক্তির অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন অনুপস্থিত, তেমন অবস্থা গড়ে উঠতে তখনও বাকি, আসন্ন বুর্জোয়া যুগেই কেবল তা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল। প্রলেতারিয়েতের এই প্রথম অভিযানসমূহের সঙ্গী ছিল যে বৈপ্লবিক সাহিত্য, অনিবার্যভাবে, তার একটা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ছিল। সে সাহিত্য প্রচার করত সর্বব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধন, স্থূল ধরনের সামাজিক সমতা।

প্রকৃতপক্ষে যাকে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট মততন্ত্র বলা চলে, অর্থাৎ সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন (৩৫) ইত্যাদির মতবাদ, তা জন্ম নিল প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া শ্রেণির সংগ্রামের সেই অপরিণত যুগে, যার বর্ণনা আগে দেওয়া হয়েছে (প্রথম অধ্যায়, 'বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত' দ্রষ্টব্য)।

এই মততন্ত্রগুলির প্রতিষ্ঠাতারা প্রকৃতপক্ষে শ্রেণি-বিরোধ এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিধ্বংসী উপাদানগুলির ক্রিয়াট দেখেছিলেন। কিন্তু প্রলেতারিয়েত তখনও তার শৈশবে, এঁদের চোখে বোধ হল সে শ্রেণির নিজস্ব ঐতিহাসিক উদ্যম এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন নেই।

শ্রেণি-বিরোধ বাড়ে যন্ত্রশিল্প বিকাশের সঙ্গে সমান তালে, সেদিনের অর্থনৈতিক অবস্থা তাই তখনো এঁদের সামনে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির বৈষয়িক শর্তগুলি তুলে ধরে নি। সুতরাং এঁরা খুঁজতে লাগলেন সে শর্ত সৃষ্টি করার মতো নতুন সমাজবিজ্ঞান, নতুন সামাজিক নিয়ম।

তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্ভাবন-ক্রিয়াকে আনতে হল ঐতিহাসিক ক্রিয়ার সথানে, মুক্তির ইতিহাস-সৃষ্ট শর্তের বদলে

কল্পিত শর্ত, প্রলেতারিয়েতের ক্রমান্বয়িক, স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেণি-সংগঠনের বদলে উদ্ভাবকদের নিজেদের মনগড়া আজব এক সমাজসংগঠন। তাঁদের কাছে মনে হল ভবিষ্যত ইতিহাস তাঁদেরই সামাজিক পরিকল্পনার প্রচারও বাস্তব রূপায়ণরূপে প্রতিভাত।

পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় সর্বাধিক নিগৃহীত শ্রেণি হিসেবে প্রধানত শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার চেতনা তাঁদের ছিল। সর্বাপেক্ষা নিগৃহীত শ্রেণি হিসেবেই প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব ছিল তাঁদের কাছে।

শ্রেণি-সংগ্রামের অপরিণত অবস্থা এবং তাঁদের স্বকীয় পরিবেশের দরুন এই ধরনের সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, তাঁরা সকল শ্রেণি-বিরোধের বহু ঊর্ধ্বে। তাঁরা চান সমাজের প্রত্যেক সদস্যের, এমন কি সবচেয়ে সুবিধাভোগীর অবস্থাও উন্নত করতে। সেইজন্য তাঁরা সাধারণত আবেদন জানান শ্রেণি নির্বিশেষে গোটা সমাজের কাছে, অধিকন্তু, একটু বেশি পছ(দ দেখিয়ে শাসক শ্রেণির কাছে। কেননা, এঁদের মততন্ত্রটা একবার বুঝতে পারলে লোকে কেমন করে না দেখে পারবে যে, এইটাই সমাজের সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ অবস্থার জন্য সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা ?

সেইজন্য সকল রাজনৈতিক, বিশেষত সকল বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে এঁরা বর্জন করেন, এঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধন করতে চান, যার ব্যর্থতাই অনিবার্য এমন সব ছোটোখাট পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এবং দৃষ্টান্তের জোরে নতুন সামাজিক শাস্ত্রের (Gospel) পথ প্রশস্ত করতে চেষ্টা করেন।

ভবিষ্যত সমাজের এ ধরনের মনগড়া আজব ছবি আঁকা হয় এমন সময়ে যখন প্রলেতারিয়েত অতি অপরিণত অবস্থার মধ্যে, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারণাও উদ্ভট, সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠন সম্বন্ধে সেই শ্রেণির প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এ ধরনের ছবির মিল দেখা যায়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট এই সব লেখার মধ্যে সমালোচনামূলক একটা দিকও আছে। বর্তমান সমাজের প্রত্যেকটি নীতিকে এরা আক্রমণ করে। তাই শ্রমিক শ্রেণির জ্ঞানলাভের পক্ষে অনেক অমূল্য তথ্যে তা পরিপূর্ণ। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য দূর করা, পরিবার প্রথার, ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্য শিল্প পরিচালনার ও মজুরি প্রথার উচ্ছেদ সাধন, সামাজিক সমন্বয় ঘোষণা, রাষ্ট্রে কাজকে কেবলমাত্র উৎপাদনের তদারকিতে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি যে সব ব্যবহারিক ব্যবস্থার প্রস্তাব এই সব লেখার মধ্যে আছে — তাদের সবকটাই শ্রেণি-বিরোধের অন্তর্ধানের দিকেই কেবল অঙ্গুলিনির্দেশ করে, সে বিরোধ সেই সময়ে সবেমাত্র মাথা তুলছিল, এবং এই সব লেখার মধ্যে ধরা পড়েছিল তাদের আদি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট রূপটুকু। এই প্রস্তাবগুলির প্রকৃতি তাই নিতান্তই ইউটোপিয়।

সমালোচনামূলক-ইউটোপিয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের যা তাৎপর্য তার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিকাশের সম্বন্ধটা বিপরীতভাবে আনুপাতিক। আধুনিক শ্রেণি-সংগ্রাম যতই বিকশিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে, ঠিক ততই সংগ্রাম থেকে এই উদ্ভট দূরে সরে থাকা, শ্রেণি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে এই সব উদ্ভট আক্রমণের সমস্ত ব্যবহারিক মূল্য ও তাত্ত্বিক যুক্তি হারিয়ে যায়। সেইজন্যই, এই সমস্ত মততন্ত্রের প্রবর্তকেরা অনেক দিক দিয়ে বিপ্লবী হলেও তাঁদের শিষ্যরা প্রতিক্ষেত্রে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতেই পরিণত হয়েছে। প্রলেতারিয়েতের প্রগতিশীল ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীতে তারা নিজ নিজ গুরুর আদি মতগুলিকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। তাই তারা চেষ্টা করে, এবং সুসংগতভাবেই চেষ্টা করে শ্রেণি-সংগ্রামকে নিস্তেজ করতে এবং শ্রেণি-বিরোধের আপসরফা ঘটাতে। তারা এখনও তাদের সামাজিক ইউটোপিয়ার পরীক্ষামূলক রূপায়ণের স্বপ্ন দেখে, বিচ্ছিন্ন 'ফালানস্টের' প্রতিষ্ঠা, 'হোম কলোনি' স্থাপন, 'ছোটো আইকেরিয়া'* প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখে, নব জেরুজালেমের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে, — আর এই আকাশকুসুম বাস্তব করার জন্য আবেদন জানায় বুর্জোয়ার সহানুভূতি ও টাকার

* 'ফালানস্টের' (phalansteres) হল শার্ল ফুরিয়ে-র পরিকল্পনায় সমাজতন্ত্রী উপনিবেশ, কাবে তার ইউটোপিয়া এবং পরবর্তী আমেরিকাস্থিত কমিউনিস্ট উপনিবেশকে আইকেরিয়া নাম দেন। (১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ওয়েন তাঁর আদর্শ কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে 'হোম কলোনি' বলতেন, ফুরিয়ের কল্পিত সর্বভোগ্য প্রাসাদের নাম 'ফালানস্টের'। যে ইউটোপিয় কল্পরাজ্যের কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান কাবে বর্ণনা করেছিলেন, তারই নাম 'আইকেরিয়া'। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

থলির কাছে। আগে যে প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীল সমাজতন্ত্রীদের বর্ণনা করা হয়েছে এরা ধীরে ধীরে নেমে যায় সেই স্তরে, তফাত শুধু তাদের আরও প্রণালীবদ্ধ পণ্ডিতিপনায় এবং তাদের সমাজবিদ্যার অলৌকিক মাহাত্ম্যে অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে।

শ্রমিক শ্রেণির সমস্ত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার এরা তাই তীব্র বিরোধী, এদের মতে এরূপ কর্মতৎপরতা কেবল নতুন শাস্ত্রে অন্ধ অবিশ্বাসের ফল।

ইংলন্ডে ওয়েনপন্থীরা এবং ফ্রান্সে ফুরিয়েপন্থীরা যথাক্রমে চার্টিস্ট (৩৬) ও সংস্কারবাদীদের (৩৭) বিরোধী।

৪
বিদ্যমান বিভিন্ন বিরোধী পার্টির সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অবস্থান

শ্রমিক শ্রেণির যেসব পার্টি এখন রয়েছে, যেমন ইংলন্ডে চার্টিস্টরা ও আমেরিকায় কৃষি-সংস্কারবাদীরা, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিষ্কার করা হয়েছে।

আশু লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য, শ্রমিক শ্রেণির সাময়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য কমিউনিস্টরা লড়াই করে থাকে, কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যেও তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি এবং তার রক্ষক। ফ্রান্সে রক্ষণশীল আর র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের* সঙ্গে হাত মেলায়, কিন্তু ফরাসি মহাবিপ্লব থেকে ঐতিহ্য হিসেবে যেসব বাঁধা বুলি ও ভ্রান্তি চলে আসছে তার সমালোচনার অধিকারটুকু বর্জন করে না।

সুইজারল্যান্ডে তারা সমর্থন করে র‍্যাডিকালদের, কিন্তু এই ব্যাপারটায় খেয়াল রাখতে ভোলে না যে এ পার্টি পরস্পরবিরোধী উপাদানে গঠিত, এদের খানিকটা ফরাসি অর্থে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী, আবার খানিকটা হল র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া।

পোল্যান্ডে তারা সেই পার্টিকে সমর্থন করে যারা জাতীয় মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসেবে কৃষিবিপ্লবের উপর জোর দেয়, সেই পার্টি যারা ১৮৪৬ সালের ক্রাকোভ বিদ্রোহে (৩৯) ইন্ধন জুগিয়েছিল।

জার্মানিতে তারা লড়ে বুর্জোয়াদের সঙ্গে একত্রে, যখনই বুর্জোয়ারা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র আর প্রতিক্রিয়াশীল পেটি বুর্জোয়াদের** বিরুদ্ধে বিপ্লবী ধরনে অভিযান চালায়।

কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈরভাবাপন্ন বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না, এইজন্য — যাতে বুর্জোয়া শ্রেণি নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান শ্রমিকরা তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, যাতে জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিগুলির পতনের পর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।

কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানিকে নজরে আনছে কারণ সে দেশে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন, ইউরোপিয়

* পালামেন্টে এই পার্টির প্রতিনিধিত্ব করতেন লেদ্রু-রলাঁ, সাহিত্যক্ষেত্রে লুই ব্লাঁ, দৈনিক সংবাদপত্র জগতে Reforme পত্রিকা। সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নামের উদ্ভাবকদের কাছে নামটির অর্থ ছিল গণতন্ত্রী বা প্রজাতন্ত্রী দলের একাংশ, যার মধ্যে সমাজতন্ত্রের কমবেশি রং লেগেছে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

এই সময় ফ্রান্সে যে পার্টি নিজেকে সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাট বলত, তাদের রাজনৈতিক জীবনে প্রতিনিধি ছিলেন লেদ্রু-রলাঁ আর সাহিত্য জগতে লুই ব্লাঁ (৩৮), সুতরাং আজকের দিনের জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সঙ্গে এর ছিল দুস্তর পার্থক্য। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

** মূল জার্মানে মার্কস ও এঙ্গেলস Kleinburgerei কথাটা ব্যবহার করেছিলেন শহরবাসী পেটি বুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলির অর্থে। — সম্পাঃ

সভ্যতার অধিকতর অগ্রসর পরিস্থিতির মধ্যে, এবং সতেরো শতকের ইংলন্ড ও আঠারো শতকের ফ্রান্সের তুলনায় অনেক বিকশিত এক প্রলেতারিয়েত নিয়ে তা সম্পন্ন হতে বাধ্য, এবং এই কারণে যে, জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী প্রলেতারিয় বিপ্লবের ভূমিকা মাত্র।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, কমিউনিস্টরা সর্বত্রই বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলন সমর্থন করে।

এই সব আন্দোলনের প্রত্যেকটিরই প্রধান প্রশ্ন হিসেবে তারা সামনে তুলে ধরে মালিকানার প্রশ্ন, তার বিকাশের মাত্রা তখন যাই থাক না কেন।

শেষ কথা, সকল দেশের গণতন্ত্রী পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য ও বোঝাপড়ার জন্য তারা সর্বত্র কাজ করে।

আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের অভীষ্ট অর্জিত হতে পারে কেবল সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার সবল উচ্ছেদ ঘটিয়েই। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণিরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ।

দুনিয়ার মজুর এক হও।

টীকা

(১) ফ্রান্সে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে।

(২) ২৩-২৬ জুন, ১৮৪৮-এর প্যারিস প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়েছে। পৃঃ ৫

(৩) ১৮৭১-এর প্যারিস কমিউন — প্যারিসে প্রলেতারিয় বিপ্লবের ফলে ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী, শ্রমিক শ্রেণির সরকার। এটি ছিল পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের সরকার এবং টিকেছিল ৭২ দিন (১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত)।

(৪) এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারের' রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার তারিখটিও ১৮৮৮-র ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের ভূমিকায় বেঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে।পৃঃ ৭

(৫) 'কলোকোল' (ঘণ্টা) — ১৮৫৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত আ. ই. হের্ৎসেন ও ন. প. ওগারিয়োভ কর্তৃক প্রকাশিত রুশ বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র। এটি ছাপা হয় লন্ডনে (১৮৫৭-১৮৬৫), তারপরে জেনেভায় (১৮৬৫-১৮৬৭)।

(৬) ১ মার্চ, ১৮৮১-তে 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়ার' সদস্যদের হাতে দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের প্রাণনাশের পর রাশিয়ার পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে। বৈপ্লবিক গোলযোগ আর 'নারোদনায়া ভোলিয়া' (জনগণের সংকল্প) সংগঠনের (সন্ত্রাসবাদী নারোদনিকদের গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি) আরও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ভয়ে তাঁর উত্তরাধিকারী তৃতীয় আলেক্সান্দর গাৎচিনায় চলে যান।

(৭) ডারউইন, চার্লস রবার্ট (Darwin, Charles Robert) (১৮০৯-১৮৮২) — ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী, বস্তুবাদী জীববিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। বিশদ জীববিদ্যাগত তথ্যাদির ভিত্তিতে তিনি জীবন্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশের তত্ত্ব সূত্রায়িত করেন। তিনি যেখান যে জীবন জগতের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল সরল রূপ থেকে জটিল রূপ, নতুন রূপগুলির আবির্ভার আর পুরনো রূপগুলির বিলুপ্তি ছিল প্রাকৃতিক (ঐতিহাসিক) বিকাশের ফল।

ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সারমর্ম এই যে প্রজাতির উদ্ভব হয় প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নির্বাচনের সাহায্যে। তিনি এই মত পোষণ করেন যে অবিরাম পরিবর্তনশীলতা ও বংশগতিই জীবের ক্রমবিকাশের প্রধান উপাদান, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পরিবর্তনসমূহ সেগুলির অস্তিত্ব রক্ষায় য়চিরস্থায়ী হয় এবং নতুন নতুন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আবির্ভাব ঘটায়। ডারউইন তাঁর তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন (Origin of Species)-এ (১৮৫৯)।

(৮) ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯) প্রুধোঁ পিয়ের-জোসেফ (Proudhon, Pierre-Joseph) (১৮০৯-১৮৬৫) — ফরাসি প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ, পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদী, নৈরাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ছোটো ব্যক্তিগত মালিকানা চিরস্থায়ী করার আশা করেছিলেন তিনি এবং পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে বৃহৎ পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি 'জনগণের ব্যাঙ্ক' গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছিলেন, এই ব্যাঙ্ক 'অবাধ ক্রেডিট' দিয়ে শ্রমিকদের সাহায্য করবে তাদের নিজস্ব উৎপাদনের উপায় সংগ্রহ করতে এবং হস্তশিল্পী হয়ে উঠতে। প্রুধোঁর আরেকটি প্রতিক্রিয়াশীল ও ইউটোপিয় চিন্তা ছিল বিশেষ 'বিনিময় ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করা, সেগুলি শ্রমজীবী জনগণের জন্য তাদের উৎপাদনগুলির 'ন্যায্য' বিপণনের ব্যবস্থা করে দেবে এবং উৎপাদনের উপকরণ ও উপায়ের ব্যক্তিগত) মালিকানাকে ক্ষুণ্ণ করবে না। প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রুধোঁ বুঝতে পারেন নি এবং শ্রেণি-সংগ্রাম, প্রলেতারিয় বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। নৈরাজ্যবাদী ছিলেন বলে তিনি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের উপরে নিজেদের অভিমত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য প্রুধোঁপন্থীদের চেষ্টার সুসংগত বিরোধিতা করেন কার্ল মার্কস আর ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। মার্কস তাঁর 'দর্শনের দৈন্য' রচনায় প্রুধোঁবাদকে আক্রমণ করেন।

(১০)লাসালপন্থীরা — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী ফের্ডিনান্ড লাসাল-এর সমর্থক ও অনুগামীরা, এরা ছিল লাইপজিগে শ্রমিকদের সমিতিগুলির এক কংগ্রেসে ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জার্মান শ্রমিকদের সাধারণ সমিতির সদস্য। সমিতির প্রথম সভাপতি লাসাল এর কর্মসূচি প্রণয়ন করেন ও কর্মকৌশল স্থির করেন। শ্রমিক শ্রেণির এক গণ রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা ছিল জার্মানিতে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের বিকাশে একটি অগ্র পদক্ষেপ। লাসাল ও তাঁর অনুগামীরা কিন্তু প্রধান প্রধান তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক প্রশ্নে সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁরা মনে করতেন যে প্রুশীয় রাষ্ট্রকে সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব, তাই তাঁরা প্রাশিয়ার সরকারের প্রধান বিসমার্কের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চেষ্টা করেছিলেন। কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস লাসালপন্থার তত্ত্ব, কর্মকৌশল ও সাংগঠনিক নীতিগুলির কঠোর সমালোচনা করেন জার্মান শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের মধ্যে এক সুবিধাবাদী ধারা বলে।

(১১) ওয়েনপন্থীরা — ব্রিটিশ ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রী রবার্ট ওয়েন (Owen, Robert) (১৭৭১-১৮৫৮)-এর সমর্থক ও অনুগামীরা।

রবার্ট ওয়েন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু পুঁজিবাদী দ্ব(দ্বগুলির মূল কারণগুলি উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি, তিনি মনে করতেন যে সামাজিক অসাম্যের প্রধান কারণ যথেষ্ট জ্ঞানালোকের অভাব, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী নয়। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের দ্বারা সামাজিক অসাম্য দূর করা যায়, এবং তিনি এরূপ সংস্কারকর্মের এক বিস্তারিত কর্মসূচি প্রস্তাব করেছিলেন। ভবিষ্যত 'যুক্তিসহ' সমাজের চিত্রটা তিনি কল্পনা করেছিলেন ছোটো, স্বশাসিত সম্প্রদায়গুলির এক অবাধ ফেডারেশন হিসেবে। কিন্তু তাঁর চিন্তাকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা শেষ হয় ব্যর্থতার মধ্যে।

(১২) ফুরিয়েপন্থীরা — ফরাসি ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রী শার্ল ফুরিয়ে (Fourier, Charles) (১৭৭২-১৮৩৭)-র সমর্থকরা।

ফুরিয়ে বুর্জোয়া সমাজের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং মানুষের আবেগগুলির অবধারণার ভিত্তিতে ভবিষ্যত 'সুসমঞ্জস' সমাজের এক ছবি উপস্থিত করেছিলেন। হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের ধারণার তিনি বিরোধিতা করতেন এবং মনে করতেন যে ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ ঘটানো যেতে পারে একমাত্র আদর্শ ফালানস্টেরগুলির (শ্রম সংঘ)। শান্তিপূর্ণ প্রচারণের মধ্য দিয়ে, সেখানে লোকে কাজ করবে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এবং তাদের শ্রম থেকে সুখ পাবে। ফুরিয়ে কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটান নি, তাঁর ফালানস্টেরগুলিতে ধনী-দরিদ্র ছিল

(১৩) কাবে, এতিয়েন (Cabet, Etienne) (১৭৮৮-১৮৫৬) — ফরাসি পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, ইউটোপিয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রবক্তা। তিনি মনে করতেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দোষত্রুটিগুলি সমাজের শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের সাহায্যে দূর করা যায়। তাঁর চিন্তাগুলি তিনি প্রতিপাদন করেন (Voyage en Icarie)-তে, (১৮৪০) এবং আমেরিকায় একটা কমিউনিস্ট জন-সম্প্রদায় গঠন করে সেগুলি রূপায়িত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর সেই পরীক্ষাকার্য ব্যর্থ হয়।

ভাইটলিং, ভিলহেল্ম (Weitling, Wilhelm) (১৮০৮-১৮৭১) — গোড়ার দিককার জার্মান শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, ইউটোপিয় 'সমতাবাদী' কমিউনিজমের তাত্ত্বিক। এঙ্গেলস লিখেছেন যে ভাইটলিঙের মতামত একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল 'জার্মান প্রলেতারিয়েতের প্রথম স্বতন্ত্র তত্ত্বগত আন্দোলন হিসেবে'।

(১৪) ৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৫) ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৬) ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৭) এক আন্তর্জাতিক সংগঠন, কমিউনিস্ট লিগের (১৮৪৭-১৮৫২) ১১ জন সদস্যের প্রাশিয়ায় বিচারের (৪ অক্টোবর — ১২ নভেম্বর, ১৮৫২) প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। সাতজন অভিযুক্তকে দেশদ্রোহের সাজানো অভিযোগে তিন থেকে ছ বছর পর্যন্ত এক দুর্গে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

(১৮) দ্রষ্টব্য, কার্ল মার্কস, 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী'।

(১৯) ১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(২০) কংগ্রেসী পোল্যান্ড — পোল্যান্ডের একাংশ, সরকারিভাবে যার নাম ছিল পোল্যান্ড রাজ্য, ১৮১৪-১৮১৫-র ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাশিয়া এটিকে দখল করে দিয়েছিল। পৃঃ ২৩

(২১) তৃতীয় নেপোলিয়ন (লুই বোনাপার্ট) (১৮০৮-১৮৭৩) — প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট (১৮৪৮-১৮৫১), ফরাসি সম্রাট (১৮৫২-১৮৭০)।

বিসমার্ক, অট্টো এডুয়ার্ড লেওপোল্ড (Bismarck, Otto Eduard Leopold) (১৮১৫-১৮৯৮) — প্রাশিয়া ও জার্মানির রাষ্ট্রনীতিক ও কূটনীতিক। তাঁর আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক নীতি যুঙ্কার আর বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ সিদ্ধ করেছিল আরও ভালোভাবে। লুন্ঠনমূলক যুদ্ধ আর কূটনৈতিক কলকৌশলে তিনি ১৮৭১ সালে প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৮৭১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলর।

'১৮৪৮-এর বিপ্লবের ছিল — তার একাধিক পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির যেমন ছিল তার চেয়ে কম নয় — অদ্ভুত সব শয্যাসঙ্গী আর উত্তরাধিকারী। যারা তাকে দমন করেছিল তারাই হয়ে উঠেছে, কার্ল মার্কস যেমন বলতেন, তার ইচ্ছাপত্র কার্যকর করার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। লুই নেপোলিয়নকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল এক স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালি, বিসমার্ককে জার্মানির বৈপ্লবিকীকরণ ঘটাতে হয়েছিল এবং ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল হাঙ্গেরির স্বাধীনতা।' (ফ. এঙ্গেলস, 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার-র' ইংরেজি সংস্করণে ভূমিকা')।

(২২) রুশ সাম্রাজ্যের দখলীকৃত পোলিশ এলাকাগুলিতে ১৮৬৩ সালে যে জাতীয় মুক্তির অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল, এখানে তার কথা বলা হয়েছে। জারের ফৌজ এই অভ্যুত্থানকে নির্মমভাবে দমন করেছিল। অভ্যুত্থানের কতক নেতারা পশ্চিম ইউরোপিয় সরকারগুলির হস্তক্ষেপের উপরে সব আশা-ভরসা স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু শেষোক্তরা কূটনৈতিক ব্যবস্থাদির মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে এবং বস্তুতপক্ষে বিদ্রোহীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(২৩) ১৮৪৬ সালে নির্বাচিত নবম পোপ পায়াস উদারপন্থী' বলে গণ্য হতেন, কিন্তু ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আগেই যিনি ইউরোপিয় চৌকিদারের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিলেন সেই রুশ জার প্রথম নিকোলাইয়ের মতোই ইনিও ছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন।

মেটেরনিখ (Metternich), অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলর ও ইউরোপিয় প্রতিক্রিয়ার স্বীকৃত নেতা। বিশিষ্ট ফরাসি ইতিহাসবেত্তা ও মন্ত্রী, বৃহৎ ফিনান্স ও শিল্প পুঁজির ভাবাদর্শবিদ এবং প্রলেতারিয়েতের অপ্রশম্য শত্রু গিজো-র সঙ্গে সেই সময়ে তাঁর বিশেষ সুসম্পর্ক ছিল। প্রুশীয় সরকারের পীড়াপীড়িতে গিজো কার্ল মার্কসকে প্যারিস থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। জার্মান পুলিস কমিউনিস্টদের নিগ্রহ করত শুধু জার্মানিতেই নয়, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডেও এবং তারা যাতে প্রচারমূলক কাজ না চালাতে পারে তার জন্য সবরকম উপায় ব্যবহার করত।

(২৪) হাক্স্টহাউজেন, আউগুস্ট (Haxthausen, August) (১৭৯২-১৮৬৬) — প্রুশীয় ব্যারন, তিনি প্রথম নিকোলাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি পান রাশিয়ায় এসে দেশের কৃষি ব্যবস্থা ও রুশ কৃষকদের জীবন অধ্যয়ন করার জন্য (১৮৪৩-১৮৪৪), রাশিয়ায় কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে জন-সাম্প্রদায়িক প্রথার জের সম্পর্কে তিনি একটি রচনা লেখেন।

(২৫) মাউরার, গেওর্গ ল্যুডভিগ (Maurer, Georg Ludwig) — জার্মান ইতিহাসবেত্তা, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জার্মানির সমাজ-ব্যবস্থা অধ্যয়নকারী, মধ্যযুগীয় মার্কা জন-সম্প্রদায়ের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এঁর অবদান বিরাট।

(২৬) মর্গান, লিউইস হেনরি (Morgan, Lewis Henry) (১৮১৮-১৮৮১) — মার্কিন নৃজাতিবিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবেত্তা। মার্কিন ইন্ডিয়ানদের জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থা অধ্যয়ন করার সময়ে সংগৃহীত বিস্তারিত

নৃজাতিবিজ্ঞানগত তথ্যাদির ভিত্তিতে তিনি আদিম জন-সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে গোত্রের বিকাশের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকন্তু, প্রাক্-শ্রেণিভিত্তিক সমাজের ইতিহাসকে তিনি কালানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত করতে চেষ্টা করেন। মর্গানের রচনাগুলি সম্পর্কে কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস উচ্চ মত পোষণ করতেন। তাঁর (Ancient Society) (১৮৭৭) রচনাটির একটি বিশদ সারাংশ মার্কস তৈরি করেছিলেন এবং এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' রচনায় মর্গান-সংগৃহীত তথ্যগত মালমশলার উল্লেখ করেছেন।

(২৭) ধর্মযুদ্ধ (Crusades) — জেরুজালেম ও অন্যান্য 'পবিত্র স্থানে মুসলমানদের হাত থেকে খ্রিস্টিয় পবিত্র নিদর্শনগুলি উদ্ধার করার অজুহাতে ১১শ-১৩শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপিয় নাইট আর সামন্ত প্রভুদের উদ্যোগে প্রাচ্যে সামরিক-উপনিবেশবাদী অভিযান।

(২৮) মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের পরবর্তী রচনাগুলিতে 'শ্রমের মূল্য' ও 'শ্রমের দাম'-এর পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন মার্কসের প্রবর্তিত আরও যথাযথ শব্দ 'শ্রম-শক্তির মূল্য' ও 'শ্রম-শক্তির দাম'।

(২৯) নির্বাচনী সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, কমন্স সভা বিলটি পাস করে ১৮৩১ সালে এবং জুন ১৮৩২-এ লর্ড সভা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এই সংস্কারকর্ম চালিত ছিল ভূস্বামী ও ধনপতি অভিজাততন্ত্রের রাজনৈতিক একাধিকারের বিরুদ্ধে এবং তা পার্লামেন্টকে শিল্প বুর্জোয়া শ্রেণির অধিগম্য করেছিল। সংস্কারের জন্য সংগ্রামে যারা ছিল চালিকা শক্তি, সেই প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণিকে প্রবঞ্চিত করেছিল উদারপন্থী বুর্জোয়ারা এবং তাদের নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় নি।

(৩০) লেজিটিমিস্টরা — বৃহৎ ভূম্যধিকারী সম্ভ্রান্তকূলের স্বার্থের প্রতিভূ, ১৮৩০ সালে ক্ষমতাচ্যুত বুরবোঁ রাজবংশের সমর্থকরা। ধনপতি অভিজাততন্ত্র ও বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির উপরে নির্ভরশীল অর্লিয়ান্স রাজবংশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, কিছু কিছু লেজিটিমিস্টরা সামাজিক বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিয়েছিল এবং দাবি করেছিল যে তারা বুর্জোয়া শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণকে রক্ষা করছে।

'নবীন ইংলন্ড' — টোরি পার্টির অন্তর্গত ব্রিটিশ রাজনীতিক ও লেখকদের একটি গ্রুপ, ১৮৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে গঠিত। বুর্জোয়া শ্রেণির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরাক্রমে ভূম্যধিকারী অভিজাততন্ত্রের অসন্তোষ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে 'নবীন ইংলন্ড' নেতারা বাগাড়ম্বরপূর্ণ ছলাকলার আহ্বয় নিয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণিকে নিজেদের প্রভাবাধীনে আনার জন্য এবং বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে তাকে ব্যবহার করার জন্য।

(৩১) সিস্‌মন্দি, জাঁ শার্ল লেওনার সিমোঁদ দ্য (Sismondi, Jean Charles Leonard Simon'd) (১৭৭৩-১৮৪২) — সুইস অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাসবেত্তা, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। সিস্‌মন্দি বৃহৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের মধ্যে প্রগতিশীল প্রবণতাগুলি দেখতে পান নি, তিনি মডেলের সন্ধান করেছিলেন পুরনো সব প্রথা আর পরম্পরার মধ্যে, শিল্প গিল্‌ড্ আর গোষ্ঠীপতিপ্রধান কৃষির মধ্যে, নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যার মিল ছিল না।

(৩২) যুঙ্কার — পূর্ব প্রাশিয়ার ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণি।

(৩৩) গ্র্যুন, কার্ল (Grune, Karl) (১৮১৭-১৮৮৭) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক। পৃঃ ৫৯

(৩৪) বেব্যেফ, ফ্রাঁসোয়া নোয়েল (Babeuf, Francois Noel Gracchus) (১৭৬০-১৭৯৭) — ফরাসি বিপ্লবী/ইউটোপিয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রবক্তা। তিনি একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন, এই সমিতি এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে যায়, এবং ২৭ মে, ১৭৯৭-তে বেব্যেফের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়।

(৩৫) সাঁ-সিমোঁ, আঁরি ক্লদ (Saint-Simon, Henri Claude) (১৭৬০-১৮২৫) — ফরাসি ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তিনি আক্রমণ করেন এবং গিল্‌ড্ নীতির ভিত্তিতে এক সমাজের আহ্বান জানিয়ে একটি কর্মসূচি উপস্থিত করেন। সাঁ-সিমোঁর মতে, ভবিষ্যত সমাজে সকলকে অবশ্যই কাজ করতে হবে, এবং সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির স্থান নির্ধারিত হয় তার শ্রমের কৃতিত্বগুলি দিয়ে। বিজ্ঞানকে শিল্পের সঙ্গে সংবদ্ধ করার,

উৎপাদনকে কেন্দ্রীকৃত ও পরিকল্পিত করার ধারণা তিনি উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু সাঁ-সিমোঁ ব্যক্তিগত মালিকানা আর পুঁজি থেকে উদ্ভূত সুদকে আক্রমণ করেন নি। রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লব সম্পর্কে তিনি নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক কর্মব্রত তিনি দেখতে পান নি, মনে করেছিলেন যে সরকারি সংস্কারকর্ম আর এক নতুন ধর্মের চেতনায় সমাজের নৈতিক প্রশিক্ষণের ফলেই শ্রেণি-বিরোধের বিলুপ্তি ঘটবে। (ফুরিয়ে ও ওয়েন সম্বন্ধে ১১ ও ১২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

(৩৬) চার্টিজম (Chartism) — দুঃসহ অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক অধিকারহীনতার ফলে ব্রিটিশ শ্রমিকদের গণ বিপ্লবী আন্দোলন। এই আন্দোলন ১৮৩০-এর দশকের শেষ দিকে শুরু হয় গণ সমাবেশ ও মিছিল দিয়ে এবং মাঝে মাঝে বিরতি সহ, চলে ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত।

(৩৭) La Reforme সংবাদপত্রের (১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত) সমর্থকদের কথা বলা হয়েছে, এরা একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন এবং গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কারকর্মের পক্ষে মত প্রকাশ করে।

(৩৮) লেদ্রু-রলাঁ, আলেক্সাঁদ্র অগ্যুস্ত (Ledru-Rollin, Alexandre Auguste) (১৮০৭-১৮৭৪) — ফরাসি প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অন্যতম নেতা, La Reforme পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, ১৮৪৮ সালে অস্থায়ী সরকারের নেতা।

ব্লাঁ, লুই (Blanc, Louis) (১৮১১-১৮৮২) — ফরাসি পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, ইতিহাসবেত্তা, ১৮৪৮-১৮৪৯-এর বিপ্লবের নেতা, বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে তিনি একটা আপস ঘটাতে চেয়েছিলেন।

(৩৯) ফেব্রুয়ারি ১৮৪৬-এ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে পোলিশ এলাকাগুলিতে এক অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্য প্রস্তুতি করা হয়। পোলিশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা ছিলেন অভ্যুত্থানের প্রধান উদ্যোক্তা।